হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পথের আলো

জ্যৈষ্ঠ * ১৪২১

একোনপঞ্চাশৎ বর্ষ * দ্বিতীয় সংখ্যা

বন্দে বন্দারুমন্দারং বৃন্দারকবিবন্দিতম্।
স্মেরাস্যং সুন্দরং সৌম্যং সীতারামং সনাতনম্॥
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংস-কুঞ্জর-কেশরী।
কালিন্দী-কলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী॥

উপদেষ্টা মণ্ডলী
সংঘাচার্য ডঃ নির্মল কুমার পাণিগ্রাহী
সংঘ-সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ
সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম-সম্পাদক
অধ্যাপক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য
কিঙ্কর সামানন্দ

সহ-সম্পাদক
শ্রী সমীরণ মুখোপাধ্যায়

সঞ্চালক, বার্তা বিভাগ
কিঙ্কর প্রণবানন্দ

সঞ্চালক, উপায়ন বিভাগ
শ্রী তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঞ্চালক, শ্রীকোষ বিভাগ
শ্রী দীপক দেবনাথ

কর্মাধ্যক্ষ
শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামিলন মঠ
৭/৭, পি.ডব্লিউ.ডি. রোড, কোলকাতা - ১০৮
দূরভাষ ঃ ২৫৭৭ ৫১৭৯/২৮৭৩ ২৪৩৮
website : www.patheralo.org

সূ চী প ত্র

বারো টাকা মাত্র

সম্পাদকীয় ৪
ওঙ্কারলোকে পরমপূজ্য কিঙ্কর বিদ্যানন্দজী ৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী *
শ্রীশ্রীঠাকুর ৬
মন্মথ শ্রীজগন্নাথ *
কিঙ্করী যোগমায়া দেবী ৮
পুরাণ কথা
রাজা চিত্রকেতুর পরিণাম * **১০**
জীবন খাতার পাতায় পাতায় *
শ্রী জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ১৩
স্মরণে
বিনম্র স্মরণে *
কিঙ্কর সমীরণ ১৬
অযোধ্যায় আচার্য্যবরের অন্ত্যাবসান ঃ স্মরণাঞ্জলি *
কিঙ্কর সেবারাম দুর্গানন্দ ২৫
সংঘ সমাচার
বিঠুরেশ্বরী সীতা ঃ সীতাময়ী বিঠুর *
পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী ২৭
শ্রীগঙ্গাশ্রমে (চন্দননগর) প্রতিষ্ঠা... উৎসব * ৩০
চৈতন্যধাম...নূতন মন্দির নির্মাণকল্পে মহোৎসব * ৩১
তপন সিকদারের পরলোক গমন * ৩৩
কবিতা
প্রণাম *
রামহরি মুখোপাধ্যায় ৩৪

প্রতি সংখ্যা ঃ বারো টাকা মাত্র *** বার্ষিক সডাক মূল্য ঃ একশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র

স ম্পা দ কী য়

একসময় কবি মনে করেছিলেন মানুষই সবার ওপরে এবং তার ওপরে আর কোনও সত্য নেই! কিন্তু আজ সমাজের দিকে চাইলে আমাদের অনুভব হয় বিপরীত। মানুষ তার পূর্ণ সামর্থ্য আজ ধ্বংসে বিনিয়োগ করেছে। মানুষের লোভে অনেকদিন আগেই পঞ্চ মহাভূত বিষিয়ে উঠেছে। আর ভৌতিক উপকরণ সংগ্রহ ও বিনাশের যে নিরলস প্রযত্ন মানব সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে দৈবীসম্পদ যে ক্রমশঃ অতি দূরে চলে যাচ্ছে সে কথা বলাবাহুল্য। আজ এই গ্রহের সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষ। বলা ভাল মানুষের মতো প্রাণীকুল! কারণ মানুষের পরিচয় নিহিত থাকে তার ধর্মে। সে যখন ধর্মচ্যুত হয় তখনই সমস্যার সূচনা হয়। এই ধর্মের দুটো দিক—১. তত্ত্বগত, ২. আচরণগত। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে আচরণের মূল্য তত্ত্বের থেকে অনেক বেশী। শুকনো তত্ত্বে চিত্তশুদ্ধ হয় না, তার জন্য লাগে একটি পরিশীলিত জীবন। এখন মানুষ অনেক তথ্য আহরণ করেছে, কিন্তু তত্ত্ব প্রবেশের সামর্থ তার আসে নি। প্রাপ্তি হল দুঃখ সহবাস।

আগে মানুষ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বজ্রপাত, দাবানল, ভূমিকম্পকে ভয় পেত, তারপর দানব, রাক্ষস, ভূতের ভাবনা এলো। লোকে সর্পাঘাত, বাঘ, ভালুককে ভয় পেত এতোকাল আর আজ সবচেয়ে বিভৎস, হিংস্র, বিষাক্ত প্রাণী হ'য়ে মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছে মানুষ নিজেই! আপনার আমার সকালটা নষ্ট ক'রে দিয়ে যায় সংবাদপত্র আর মিডিয়া। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের যে নখদন্ত নিয়ত আমাদের রক্তাক্ত ক'রে চলেছে সেই বার্তাবহ মাধ্যম বা যিনি ভুক্তভোগী উভয়েরই আর দুঃখের শেষ নেই। জগৎটাকে ঋষিরা দেবতা বলে অনুভব করেছিলেন, আর এখন আমরা ভোগ্য ব'লে বুঝি, বাজার ব'লে বুঝি। অনুভবের সামর্থ্য 'মানুষের মতো' প্রাণীকুলের থাকে না! সঙ্গীত, সাহিত্য, কাব্য, দার্শনিক বিশ্লেষণ, বিজ্ঞান চর্চা, অর্থনীতি নির্ধারণ—সর্বত্রই ঐ অমানবোচিত বোঝাবুঝির উদ্‌গারে পরিপূর্ণ হ'য়ে রয়েছে।

মানুষ ভাল নেই। তাকে আনন্দরাজ্যে আবার অভিষিক্ত করার জন্যই শ্রীভগবান ওঙ্কারনাথদেব এই একবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন। তিনি মানুষের এই দুঃখের মূলোচ্ছেদের জন্য অনেক ওষুধ, পথ্য, অনুপানের ব্যবস্থা করেছেন। তার মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—আহারশুদ্ধি। 'বাণী-বিলাস' গ্রন্থে তিনি বলছেন—অখাদ্য খেয়ে দেহটা অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে। রোগের আর অপরাধ কি? রোগ তো তুমি বরণ ক'রে নিয়েছো। অভক্ষ্য কুভক্ষ্য খেয়ে, স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়স্বজনকে খাইয়ে নিজেও শেষ হলে, স্ত্রীপুত্রাদিকেও মরণের দিকে টেনে নিয়ে চললে। অসংযম আর মরণ এক কথা। মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, হাঁসের মাংস, ডিম—এসব উত্তেজক ভোজনে কেউ সংযত থাকতে পারে না। যদি শান্তি চাও তাহলে সাত্ত্বিক আহার কর!

শ্রীশ্রীঠাকুর 'অন্ন' বিষয়ে আজকের মানুষকে সচেতন করেছেন, কারণ অন্নের এক অংশ থেকে তৈরী হয় মন। আর মন যেমন জগতটাকে দেখাও তেমন। যেমন ভাবে জগৎকে দেখি—তেমনি জানি, জানার অনুপাতে চাওয়া আর চেষ্টা। শেষপর্যন্ত কাম্য বস্তু পেয়েও দুঃখ, না পেলে তো নাকেকান্নার শেষ নেই। দুঃখ না পেলে জীবনটা যে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে!

শ্রীওঙ্কারনাথদেব যে আহার শুদ্ধির কথা বলেছেন, তাতে পাচক ও পরিবেশকেরও শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন, রান্না করার সময় মনে মনে নাম করবে। জপ করবে। মুখে পান বা অন্য মশলা কিছু রাখবে না। রান্নাঘর থেকে বাইরে এলে হাত-পা ধুয়ে তবে রান্নাঘরে ঢুকবে। ঠাকুরঘরের মতো রান্নাঘরের মর্যাদা রক্ষা করতে হয়। রান্নার পাত্রে একটি তুলসী দিয়ে তারপর খাবার ঢেলে রাখবে। এবং যিনি অন্ন গ্রহণ করবেন তাঁরও কিছু নিয়ম আছে—হাত-পা ধুয়ে শুদ্ধ অন্নের দ্বারা শ্রীভগবানের শরীর এই দেহের সেবা করছি—এমন ভাবনা ক'রে শ্রীভগবানকে নিবেদন ক'রে মৌন নিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে স্মরণ ক'রে বৈশ্বানররূপী শ্রীভগবানকে আহুতি দেবে। একইসঙ্গে অন্নদাতা, পাচক, পরিবেশক—এঁরা পঞ্চপিতার অন্যতম তাই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করবে। এবং পরিবেশক, পাচকও মনে রাখবেন যে তিনি ভগবানের সেবা করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—কিছুদিন এইভাবে আহারশুদ্ধি রক্ষা ক'রে যদি কেউ খাদ্য গ্রহণ করে এবং নাম আশ্রয় করে, তাহলে তিনি জ্যোতির্ময় আত্মার দর্শন ও তাঁর ডাক্ শুনতে পাবেন। অবশ্য ব্রাহ্মণকে নিত্য সন্ধ্যা, গায়ত্রী ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি ক'রে যেতে হবে। অন্যবর্ণের সকলেই নাম ক'রে ও আহারশুদ্ধি ক'রে কৃতার্থ হ'য়ে যাবেন। আমাদের ভাল থাকতে হ'লে অশুদ্ধ অন্নভোজনে, উপাসনাহীনতায় দেহের যে উপাদান দুষ্ট হ'য়ে গেছে তা নাম ও শুদ্ধান্ন ভোজনের দ্বারা পরিবর্তন ক'রে নিতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন ঐভাবে চললে সকল জ্বালার অবসান হবেই। মনে রাখতে হবে—"অন্নভোজন নয়—অন্নের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা।" শ্রীগুরুদেবের সেবা।

ওঙ্কারলোকে পরমপূজ্য কিঙ্কর বিদ্যানন্দজী

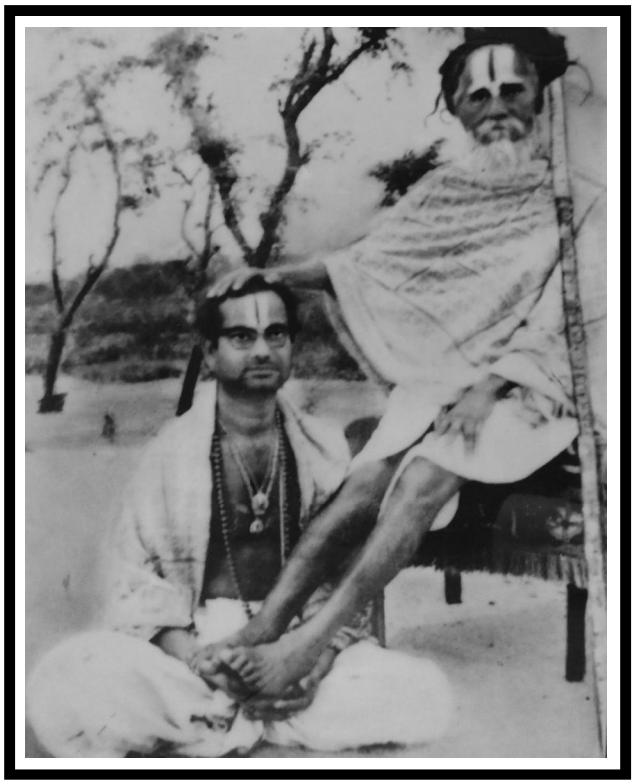

শ্রীগুরুবিগ্রহেষু/শ্রীগুরুমূর্তিষু,

সময়োচিত নিবেদন এই যে, গত ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ (ইং ৭ই জুন, ২০১৪) শনিবার অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সর্বজনপূজ্য আচার্য্য কিঙ্কর বিদ্যানন্দজী (অধ্যাপক ড. নির্মল কুমার পাণিগ্রাহী) ওঙ্কারলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। আগামী ৩রা আষাঢ়, ১৪২১, (ইং ১৮ই জুন, ২০১৪) বুধবার তাঁর পারলৌকিক কৃত্যাদি শ্রীশ্রীঠাকুরের অযোধ্যাস্থিত আশ্রমে অনুষ্ঠিত হবে এবং আগামী ৯ আষাঢ়, ১৪২১ (ইং ২৪ জুন, ২০১৪) মঙ্গলবার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ঐ আশ্রমেই সাধুভাণ্ডারারও আয়োজন করা হয়েছে।

পরমপূজ্য কিঙ্কর বিদ্যানন্দজীর স্মরণ সভা মহামিলন মঠ, কলকাতায় আগামী ২৮শে আষাঢ়, ১৪২১ (ইং ১৩ জুলাই, ২০১৪) রবিবার অনুষ্ঠিত হবে।

এই উপলক্ষ্যে আপনাদের উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

১৫ জুন, ২০১৪

অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায় ট্রাস্টী বোর্ড

শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রণব-প্রেমামৃত ভাষ্য

শ্রীশ্রীঠাকুর

[শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত চণ্ডী থেকে শ্রীশ্রীপ্রণব প্রেমামৃত ভাষ্যের শ্রীহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাই এখান থেকেই পাঠকের কাছে গ্রন্থটি নিবেদন করা হল। চণ্ডীর এক থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত ও শ্রীগুরু প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অনেকদিন পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মহামিলন মঠে পাওয়া যাচ্ছে। —সম্পাদক]

(পূর্বানুবৃত্তি)

অষ্টম অধ্যায়, রক্তবীজবধ

আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পুরয়ামাস ধরণী গগনান্তরম্॥ ৮

অন্বয় ঃ চণ্ডিকা অতি ভীষণং সৈন্যং আয়াতং দৃষ্ট্বা ধরণী গগনান্তরম্ জ্যাস্বনৈঃ পুরয়ামাস॥ ৮

বঙ্গানুবাদ ঃ কৌষিকী অতি ভয়ানক সেই সৈন্যদল আসিতেছে দেখিয়া পৃথিবী হইতে ভুবর্লোক পর্যন্ত জ্যা-টঙ্কার ধ্বনিতে পূরিত করিলেন॥ ৮

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ চণ্ডিকা কৌষিকী অতি ভীষণং ভয়জনকং তৎ সৈন্যং বলং আয়াতং আগতং দৃষ্ট্বা বিলোক্য ধরণীগগনান্তরং ভুবর্লোকং জ্যাস্বনৈঃ মৌর্ব্বীটঙ্কারধ্বনিভিঃ পূরয়ামাস পূরিতবতী, যদ্বা গগনপদেষু গগনগামিনো দেবা উপলক্ষ্যন্তে ধরণী সাহচর্য্যাৎ তল্লোকস্য গ্রহণং স্বর্গপর্যন্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা শতযোজনান্তরমাকাশঃ।

ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ॥ ৯

অন্বয় ঃ হে নৃপ, ততঃ সিংহঃ অতীব মহানাদং কৃতবান্, অম্বিকা ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদান্ উপবৃংহয়ৎ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ ঃ হে রাজন্! অনন্তর সিংহ অত্যন্ত মহানাদ করিয়াছিলেন, কৌষিকীও ঘণ্টাধ্বনিতে সেই নাদ বর্দ্ধিত করিলেন॥ ৯

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ হে নৃপ! রাজন্ ততঃ অনন্তরং সিংহঃ দেবীবাহনঃ অতীব অতিশয়ং মহানাদং মহাশব্দং কৃতবান্ চকার অম্বিকা কৌষিকী চ ঘণ্টাস্বনেন ঘণ্টাধ্বনিনা তান্নাদান্ তচ্ছব্দান্ উপবৃংহয়ৎ উপাবৃংহয়ৎ অড়াগমভাবশ্ছান্দসঃ অতীবোপবৃংহয়ৎ ইতি ব্যবহিতে নাম্বয়ো বা।

ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা॥ ১০

অন্বয় ঃ বিস্তারিতাননা নাদাপূরিত দিঙ্মুখা কালী ভীষণৈঃ নিনাদৈঃ ধনুর্জ্যাসিংহ ঘণ্টানাং জিগ্যে॥ ১০

বঙ্গানুবাদ ঃ প্রকটিতবদনা কালী শব্দের দ্বারা দিক্‌সকল পরিপূরিত করত ভয়ঙ্কর নাদে ধনু, জ্যা, সিংহ ও ঘণ্টার শব্দকে অভিভূত করিলেন॥ ১০

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ বিস্তারিতাননা অতি প্রকটিতমুখী নাদাপূরিতদিঙ্মুখা নাদৈঃ সম্যক্ পূরিতানি দিঙ্মুখানি দিশো যয়া কালী চণ্ডিকা ভীষণৈঃ ভয়ঙ্করৈঃ নিনাদৈঃ নাদৈঃ ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টাঃ তদ্ধনীন্ দ্বিতীয়ায়াং ষষ্ঠী জিগ্যে অভিভূতবতী।

তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দ্দিশম্।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ॥ ১১

অন্বয় ঃ দৈত্যসৈন্যৈঃ তন্নিনাদং উপশ্রুতা সরোষৈঃ দেবী সিংহঃ তথা কালী চতুর্দ্দিশম্ পরিবারিতঃ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ ঃ দৈত্যসৈন্যগণ সেই নাদ সমীপে শ্রবণ করত সক্রোধে দেবী সিংহ ও কালীকে চতুর্দ্দিকে আবৃত করিয়া অবরুদ্ধ করিল॥ ১১

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ দৈত্যসৈন্যৈঃ অসুরবলৈঃ তন্নিনাদং তচ্ছব্দং উপশ্রুত্য সমীপে শ্রুত্বা সরোষৈঃ দেবী কৌষিকী সিংহঃ তথা কালী চামুণ্ডা চতুর্দ্দিশম্ চতুসৃষু দিক্ পরিবারিতাঃ চতুর্দ্দিক্ষু আবৃত্য অন্তঃস্থাপিতা।

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ॥ ১২

ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ॥ ১৩

অন্বয় ঃ হে ভূপ এতস্মিন্নন্তরে সুরদ্বিষাং বিনাশায় অমরসিংহানাং ভবায় অতিবীর্য্যবলান্বিতা ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং তথা ইন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ (তেষাং) শরীরেভ্যঃ বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈঃ চণ্ডিকাং যযুঃ॥ ১২-১৩

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভূপতে! এই সময়ে অসুরগণের বিনাশজন্য ও দেবশ্রেষ্ঠগণের মঙ্গলের জন্য অতিবীর্য্যবলান্বিত ব্রহ্মা, শিব, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের শক্তিসকল তাঁহাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া সেই সেই রূপে চণ্ডিকার সমীপে উপস্থিত হইলেন॥ ১২-১৩

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ হে ভূপ রাজন্ এতস্মিন্নন্তরে ইত্যবসরে সুরদ্বিষাং অসুরাণাং বিনাশায় সংহন্তুং অমরসিংহানাং দেবশ্রেষ্ঠানাং ভবায় মঙ্গলায় অতিবীর্য্যবলান্বিতা অত্যুৎসাহসামর্থ্যযুক্তা, অতিশয়িতং বীর্য্যমুৎসাহো বলং সামর্থ্যং তাভ্যাং অন্বিতা যুক্তা। ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং বিধিভবস্কন্দহরীনাং তথা এবং ইন্দ্রস্য মঘোনঃ চ অপি (ও) শক্তয়ঃ সামর্থ্যরূপাদেব্যঃ শরীরেভ্যঃ দেহেভ্যঃ বিনিষ্ক্রম্য নিঃসৃত্য তদ্রূপৈঃ ব্রহ্মাদীনাং প্রকৃতিভিঃ উপলক্ষিতাঃ সত্যঃ চণ্ডিকাং যযুঃ প্রাপ্তবত্যঃ।

প্রশ্ন ঃ এই সব শক্তি কি ব্রহ্মাদি হইতে ভিন্না?

উত্তর ঃ না। 'শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ'---শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা, অনলের উষ্ণত্ব যেমন অভিন্ন—সেইরূপ এইসব শক্তিসমূহও ব্রহ্মাদি হইতে অভিন্না, মহাশক্তির সহায়তা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। এই মহাশক্তিই সর্ব্বশক্তির কেন্দ্রীভূতা। শুম্ভের সহিত যুদ্ধকালে সমস্ত শক্তিকেই আপনার শরীরে লীন করিয়া বলিবেন—

'অহং বিভূত্যা বহুভিরিহরূপৈ র্যদাস্থিতা।
তৎসংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব।।'

প্রশ্ন ঃ বুঝিলাম না, পৃথক্ পৃথক্ দেবগণের শক্তি দেবীর শক্তি কি প্রকারে হইলেন?

উত্তর ঃ দেবী কে আগে শ্রবণ কর।

'সর্ব্বং বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ। ক্বাসি ত্বং মহাদেবি।
সাব্রবীদহং ব্রহ্মস্বরূপিণী।
মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যঞ্চ।'
—দেব্যুপনিষৎ।

সমস্ত দেবতাগণ দেবীর নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন---হে মহাদেবি! আপনি কে? তিনি বলিয়াছিলেন---আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, আমা হইতে প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ শূন্য ও অশূন্য। আমি আনন্দা, আমি অনানন্দা। আমি বিজ্ঞান, আমি অবিজ্ঞান, আমি ব্রহ্ম, আমি অব্রহ্ম। ইহা আথর্ব্বণীশ্রুতি বলিয়াছেন। আমি পঞ্চভূত, আমি অপঞ্চভূত, আমি অখিল জগৎ, আমি বেদ, আমি অবেদ, আমি বিদ্যা, আমি অবিদ্যা, আমি অজা, আমি অনজা, আমি ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্।

দেবীসূক্তে বলিয়াছেন—

'ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥'

আমি একাদশ রুদ্ররূপে এবং অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি। আমি দ্বাদশ আদিত্যরূপে বিচরণ করি, আমিই বিশ্বদেবরূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্রাবরুণকে, ইন্দ্র এবং অগ্নিকে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি। এক প্রণবরূপিণী ব্রহ্মময়ী মাতা ভিন্ন জগতে অন্য কিছু নাই।

ক্রমশঃ

গুরুদেবের কৃপা ধন্যা

শ্রীমতী মিঠু চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া

ঃ যোগাযোগ ঃ
উপেন ব্যানার্জী লেন, সাতঘাট
গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলি
পিন- ৭১২১৩৭

ঃ দূরভাষ ঃ
(০৩৩) ২৬৮৩-২৯৪৭
৯৮৩১৫৮৪৭৯৩

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ

কিঙ্করী যোগমায়া দেবী

আমরা সবাই যারা ঠাকুরের কাছে মন্ত্র নিয়েছি, আসি, বসি বাড়ীতে, শ্রীশ্রীঠাকুর দেহে থাকাকালীন অনেক সময় তাঁর শিষ্যদের সাধনপথে এগিয়ে দেবার জন্য তাঁর সামনে আসনে বসাতেন। ঠাকুরের পর মাধব স্বামীজীকেও সেবিকা দেখেছে যে তাঁর শিষ্যদের তিনি এইভাবে সাধনজগতে এগিয়ে দেওয়ার জন্য আসনে বসাতেন। তাই এখন সেবিকারও বয়স হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের দেওয়া পুঁটলিটা সেবিকা যদি নিয়ে চলে যায় তবে ঠাকুরের কাছে সেবিকাকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই সেবিকাও ঠাকুরের মন্ত্র নেওয়া বাবা-মায়েদের যারা আগ্রহী তাদেরকে আসনে বসিয়ে ঠাকুরের কাছে স্বয়ং ভগবানের কাছে এগিয়ে দেওয়ার জন্য সেবিকার পুঁটলিতে থাকা সবকিছুই বাবাদের মায়েদের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মৃত্যুঞ্জয় যোগ ঠাকুর দিয়ে গেছিলেন সবাইকে দেবার জন্য। আজ তাই যে সমস্ত মায়েরা বাবারা জপধ্যান করছে, অবশ্যই তারা ঠাকুরের অনুভূতিতে ভরে আছে। তাঁর অনুভূতি না পেলে কিছুই পাওয়া হলো না। সেবিকার আকাঙ্ক্ষা একটাই ঠাকুরের শ্রীচরণে যে সমস্ত বাবারা মায়েরা ঠাকুরের আদর্শ মেনে জপধ্যান করে, তারা যেন সেই শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তারা যাদের গায়ে মাথায় স্পর্শ করে তারাই যেন আনন্দ অনুভব করতে পারে। তাদের ভেতরের সব অন্ধকার যেন ঘুচে যায়। কারণ আমরা সবাই স্বয়ং ভগবানের দেওয়া সিদ্ধমন্ত্র জপ করছি। এ কোন রহস্য নয়, এটাই সত্য, যে ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস রাখবে, তা সিদ্ধ হবেই। ঠাকুরের দেওয়া সিদ্ধমন্ত্র কখনোই বিফলে যাবে না। কিন্তু আমাদের কর্মফলও আছে। আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সুকর্মফলের জন্যই আমরা ঠাকুরকে পেয়েছি। তার কাছে সিদ্ধমন্ত্র পেয়েছি। সতীসঙ্ঘে গেলে কিংবা যেখানে ঠাকুরকথা হয় সেখানে গিয়ে নাম করলে বা ঠাকুরকথা শুনে তারপর হৈ হৈ করে বাড়ী চলে গেলে হবে না। ঠাকুরকথাকে অনুভব করতে হবে অন্তর দিয়ে এবং তাকে সর্বদা অন্তরে অনুরণিত করতে হবে।

যেমন কারেন্ট থাকলে আলো জ্বলে আবার লোডশেডিং হলে আলো থাকে না, তেমনি আমাদের জীবনেও কখনো ঝড় আসে কিন্তু সে সময় জপধ্যান না হলেও বিরক্তি আসলে চলবে না। হাজার ঝড় উঠলেও মনকে জপের মধ্যেই রাখতে হবে। সে তো কোন বন্ধনে বাধা পড়েনি। সমস্ত ঝড় বাধা বিপত্তি ঠেলে জপ করলে আপনি ঝড় থেমে যাবে। গুরুদেবের সান্নিধ্য পাবার সুযোগ থাকলে ঝড়ের সমাধান গুরুর কাছে করতে পারলে আরও ভাল। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ভালো লাগছে না বলে জপধ্যান বন্ধ করলে চলবে না। কারণ যেদিন চলে যাবে সেদিন আর ফিরে আসবে না। সেজন্য আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের চলে যাবার সময় কখন আসবে আমরা নিজেরাই জানি না, নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি প্রস্তুত আছে, এলেই উঠে পড়তে হবে। কিন্তু তখন জপধ্যান হলো না, ঠাকুরের মন্ত্র নিয়ে কিছু পেলাম না তা ভাবলে চলবে না। এ কারণে সর্বদা জপধ্যান করে যেতে হবে। সেবিকা তার কাছে আসা ঠাকুরের সন্তানদের কাছ থেকে তাদের অনুভবের কথা শুনতে ভালোবাসে এবং আনন্দ পায় যখন শোনে তারা সবসময় ঠাকুরকে নিয়ে, তার অনুভূতিতেই ডুবে থাকে। এরা বিপদে পড়লে গোপনেও ঠাকুর তাদের রক্ষা করেন। এইজন্য শত বিপদেও জপ করতে হবে; মন

বসাতে না পারলে ‘গুরু গুরু’ জপ করতে হবে এবং তাঁর চরণে প্রার্থনা জানাতে হবে—‘জপ করিয়ে নাও ঠাকুর।’ এই প্রার্থনা কায়মনবাক্যে করতে হবে, তাহলে ফল পাওয়া অবশ্যই সম্ভব। তাঁকে ডাকার মধ্যে অন্তরের আকুলতা থাকতে হবে। তাতে যেন ‘আমি, আমি’ বোধ না থাকে। আমাদের মধ্যে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই ছয়টি রিপু থাকে। ঠাকুর এই রিপুদের দিয়েই জীবাত্মাকে পাঠান। ভালোমন্দ নিজেকে বিচার করতে হবে। এই রিপুগুলিকে সংযত করে যদি ভগবানকে ডাকা যায়, কৃষ্ণকথা, রামকথা শোনা যায় তবে মন তাতেই বিভোর হয়ে থাকবে এবং মনে এক অপার আনন্দ বিরাজ করবে। তখন যেন অন্তরে অলৌকিক আনন্দের হিল্লোল হবে এবং আপনা থেকেই অন্তরে রামধ্বনি, কৃষ্ণধ্বনি ধ্বনিত হবে।

আমরা সংসারী, সংসার করলে ভাবনাচিন্তা, দুঃখ, কষ্ট সবই থাকবে কিন্তু তার ভেতরেও তাঁকে নিয়ে থাকলে আর কোন অসুবিধা হবে না। যার মৃত্যু হয়, তাকেই চিতায় তোলা হয়, তার সঙ্গে কেউ যায় না; এমনকি গায়ের মূল্যবান কাপড় থাকলে তাও খুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ কেউ কারোর নয়, আমরা নিরাশ্রয়, ভগবান ছাড়া আর আমাদের কোন আশ্রয় নেই।

এই আসা যাওয়া পথের ধারে।
সুখ দুঃখ চলে মোর হাত ধরে।
কবে হবে শেষ এই যাওয়া আসা বলিতে পারি না।
কখনো আলোয় ভরে থাকে প্রাণ
আবার আঁধারে দীপ হয়ে যায় ম্লান।
আসিয়া ধরায় পাতকী তরাও।
ভালোবাসা দিয়ে বুকে টেনে নাও।
তুমি মোদের আশীষ দাও, ভরে থাক অন্তরে।

নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল ভক্ত, শিষ্য, অনুরাগীদের জানান হচ্ছে যে, অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের পরিচিতি মূলক গ্রন্থ ‘‘ওঙ্কারদর্পণ” এর হিন্দী সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। তারজন্য আমাদের প্রয়োজন—শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল আশ্রম, মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ছবি (৪টি করে), বর্তমান সেবক/সেবিকাবৃন্দের নাম, ফোন ইত্যাদির তালিকা। সমগ্র দেশব্যাপী ঐ তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে আমরা আপনাদের সাহায্য প্রার্থী।

‘‘ওঙ্কারদর্পণ” বাংলা ভাষায় যা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে স্বল্প সময়ে সংগৃহীত কিছু তথ্যই একত্রিত করা গিয়েছিল। সেই ন্যূনতা দূর ক’রে হিন্দী সংস্করণে আমরা একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনে প্রয়াসী, তাই এই বিষয়ে আপনাদের সহৃদয় যোগদান আমরা চাইছি। সব তথ্য, ছবি প্রভৃতি পাঠানোর জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন—

শ্রীমৎ কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজজী মহারাজ
মহামিলন মঠ, ৭/৭, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলকাতা - ৭০০ ১০৮
ইমেল ঠিকানা ঃ kinkarvitthalramanuja@gmail.com
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২৫৭৭-৫১৭৯/ ০৯৪৩৩৯৮৪৮

শ্রী সুব্রত রায়চৌধুরী
২৩-সি, ও.সি.এস অ্যাপার্টমেণ্ট
ময়ূর বিহার এক্সটেনসন, ফেস - ১, দিল্লী- ১১০০৯১
ইমেল ঠিকানা ঃ subrotojoy@gmail.com
দূরভাষ ঃ ০৯৫৬০১৯৮২৫২

পুরাণ কথা

রাজা চিত্রকেতুর পরিণাম

পুরাকালে সুরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে এক মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, শৌর্য, বীর্য, ঔদার্য, রূপ-লাবণ্য বংশ-গৌরব কোনকিছু কম ছিল না তাঁর। তাঁর সুশাসনে সমগ্র রাজ্যের কোথাও কোনদিন কোন অশান্তি, অভাব-অভিযোগের কথা শোনা যেত না। এমনটাই ছিল সুরসেন, শুধু সুখ-শান্তি আর ঐশ্বর্যই যেন প্রতিষ্ঠিত ছিল সমগ্র দেশে। এত সুখের অধিকারী হয়েও সে দেশের রাজা চিত্রসেনের মনে এতটুকু সুখ বা শান্তি ছিল না। তিনি কেবলই ভাবতেন যে, তাঁর অবর্তমানে এই অতুল ঐশ্বর্য, রাজ্য উপভোগ করবে কে? কে এই সুরসেনের উপর একইভাবে আধিপত্য বিস্তার করে তাঁর স্নেহের প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবে? আর কেই বা তাঁর পূর্বপুরুষদের জলপিণ্ডাদি দান করে তাঁকে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত করবে? আর এই সকল চিন্তার মূলেই ছিল তার পুত্রহীনতা। পুত্রলাভের বাসনায় চিত্রকেতু বিয়ে করেছিলেন তো বহু কিন্তু একটিও সন্তানলাভের অধিকারী হলেন না।

এরকম বহুকাল কেটে গেলে একদিন মহর্ষি অঙ্গিরা রাজা চিত্রকেতুর কাছে এলেন। রাজাও পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালে ঋষিবর রাজার কুশল সংবাদ জানলেন এবং এই এত ঐশ্বর্য, আমোদ-প্রমোদ, আহ্লাদের মধ্যে থেকেও কী করে রাজা এত বিষণ্ণ তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। এর উত্তরে রাজা জানালেন তার পুত্রহীনতার কথা এবং বললেন—"মহাত্মন্! আমার এই বিপুল সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য-সম্পদ, অনুগত দাস-দাসী এমনকি স্বর্গের ইন্দ্রত্বও এর নিকট তুচ্ছ। কিন্তু ঋষিবর, আমি নিঃসন্তান, এ সকলই আমার ব্যর্থ, আমার মৃত্যুর পরে আমার পিতৃপুরুষদের একটু জল পাবারও আর উপায় রইল না। ভগবন্! জগতে আপনার অসাধ্য কিছুই নেই, আপনিই আমায় এই বিপদ হতে উদ্ধার করুন, আমাকে পিতৃঋণ হতে মুক্ত করুন।"

রাজার এই নিদারুণ মর্ম-বেদনায় মহর্ষি অত্যন্ত করুণা-পরবশ হয়ে পড়েন। রাজার পুত্রকামনায় তিনি ত্বষ্টৃ দেবতার যাগ করলেন এবং যজ্ঞশেষে বড়রাণী কৃতদ্যুতিকে চরু প্রসাদরূপে খেতে দিলেন এবং রাজাকে বললেন—"তোমার যে পুত্র জন্মাবে, সে তোমার আনন্দ ও শোক উভয়েরই কারণ হবে।" এই বলে সেখান থেকে মহর্ষি দ্রুত প্রস্থান করলেন।

এদিকে যথাকালে কৃতদ্যুতির গর্ভে রাজা চিত্রকেতুর একটি পুত্র হল। রাজা সেই পুত্রের যথাবিধি জন্মসংস্কার সম্পাদন করলেন। সমগ্র রাজপুরীতে আনন্দের ঢেউ এল। রাজকুমারের জন্মে প্রকৃতপক্ষে সকল সুরসেনবাসীই পরম আনন্দিত হলেন। কিন্তু কেবলমাত্র আনন্দিত হতে পারলেন না বড়রাণীর সপত্নীগণ, তারা নিজেদের পুত্রহীনতার কথা ভেবে আরো বেশী বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। পুত্রলাভের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ায় ওদিকে রাজা চিত্রকেতুও অন্যান্য রাণীদের তুলনায় কৃতদ্যুতিকেই বেশী ভালোবাসতে লাগলেন। ফলতঃ বড়রাণীর সপত্নীরা দ্বিগুণ ঈর্ষায় একেবারে জ্বলে পুড়ে মরতে থাকল। এবং এই ঈর্ষা শেষে এক ভয়ানক রূপ নিল। তারা তখন চিত্রকেতুর একমাত্র আশা ভরসার স্থল, সমগ্র সুরসেনবাসীর আনন্দ-নিকেতন, কৃতদ্যুতির নয়নের মণি সেই সন্তানটিকেই গোপনে বিষ প্রয়োগে এই জগৎ সংসার থেকে একেবারে বিদায় করে দিল।

রাণী কৃতদ্যুতি ও রাজা চিত্রকেতু এই ভয়ঙ্কর শোকাবহ সংবাদ পেয়ে একেবারে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এসে কুমারের মৃতদেহ দেখে মূর্ছা গেলেন। এক-একবার সংজ্ঞা আসে তো আবার বিলাপ করতে করতে

তাঁরা অচৈতন্য হঁয়ে পড়েন। সমগ্র রাজপুরী এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় শোকস্তব্ধ। আর পুরবাসিগণ তো শোকসাগরে নিমজ্জিত। সেই সেদিনের আনন্দ-হিল্লোলে মুখরিত রাজপুরী আর আজ সেই রাজপুরীই শোকের নিদারুণ আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন!

এরূপ শোকাতুর অবস্থায় যখন রাজা রাণী উভয়েই বিলাপ করছেন তখন স্বয়ং মহর্ষি অঙ্গিরা ও নারদ এসে উপস্থিত হন। কুমারের শবদেহের পাশে শায়িত শোকাভিভূত রাজাকে দেখে তাঁরা বিভিন্ন সদুপদেশ দিতে থাকলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন—''হে রাজেন্দ্র! কার জন্য তুমি শোক করছ? যার জন্যই বা শোক করছ সে তোমার কে? আর তুমিই বা তার কে? কী সম্বন্ধ তোমাদের? এই পৃথিবীতে সকল জীবই কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই কখনও এসে পরস্পর মিলিত হয়; আবার কখনও বা বিযুক্ত হয়। ফলতঃ পুত্র, পৌত্র ইত্যাদি এই সকল সম্বন্ধ বৃথা কল্পনামাত্র। তাই বৃথা শোকের প্রয়োজনই বা কি? যে চলে গেছে অর্থাৎ যার জন্য আজ তোমার পুত্রকে মৃত বলে মনে হচ্ছে সে তো নিত্য। তার কখনও বিনাশ ঘটে না। সে তোমার এই পুত্রের জন্মের পূর্বেও ছিল, আজও আছে আর পরেও থাকবে।''

তাঁদের কথা শুনে রাজা চিত্রকেতু শোকসাগর থেকে উঠলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনারা কারা? জ্ঞানসম্পন্ন আপনার মহীয়ান্ লোকেদের থেকেও মহত্তর। এই দুঃসময়ে আপনাদের এরকম অনুগ্রহ লাভও নিশ্চয়ই আমার কোন শুভ অদৃষ্টের ফল।''

মহর্ষি অঙ্গিরা তখন বললেন, ''রাজন্! আমিই তোমার এই পুত্র কামনায় যজ্ঞ করেছিলাম। আমি মহর্ষি অঙ্গিরা এবং ইনি হলেন দেবর্ষি নারদ। তুমি ভগবদ্ভক্ত, পুত্র শোকে অভিভূত বা অবসন্ন হওয়া তোমার পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। তাই আমিই তোমাকে পরমজ্ঞান দানের জন্য এখানে এসেছি। আগে যখন আমি তোমার কাছে এসেছিলাম তখন তুমি বিষয়ে মগ্ন ছিলে। তাই বিষয় বাসনার প্রতি তোমার প্রবল আকর্ষণ জেনে আমি তখন তদনুরূপ আচরণই করেছিলাম। অর্থাৎ, যাতে তুমি পুত্রলাভ করতে পার সেই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেছিলাম। এখন তো নিজেই দেখতে পাচ্ছ যে স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ্ সকলই সন্তাপদায়ক, কারণ এরা প্রত্যেকেই ক্ষণস্থায়ী।''

ঋষিবর অঙ্গিরার কথা শেষ হলে নারদ বললেন, ''হে নরেন্দ্র! তোমার প্রবোধের জন্যই তোমার মৃতপুত্রের জীবাত্মাকে এখানে নিয়ে আসছি, তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।''

এই ব'লে নারদ যোগবলে সেই মৃত রাজপুত্রের জীবাত্মাকে সেখানে নিয়ে আসলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, ''দেখ, তোমার জন্য তোমার পিতামাতা কিরকম ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তোমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী তোমা বিরহে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। ফলতঃ, তুমি আর কালবিলম্ব না করে এই দেহমধ্যে প্রবেশ কর। আমরা তোমার দেহের পুনরায় সংস্কার করে দিচ্ছি। এখনও তোমার পরমায়ু অবশিষ্ট আছে। তাই তোমার পিতামাতাকে আর বৃথা কষ্ট দিও না।''

জীবাত্মা সবিস্ময়ে বললেন, ''আমার আবার পিতামাতা কে? আমি তো নিজ কর্মফলেই দেব, মনুষ্য ও পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করি। জীব শরীর ধারণ করে যতক্ষণ যার কাছে থাকে, ঐ ততক্ষণই তার সকল সম্বন্ধ থাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রিয়, অপ্রিয়, আত্মীয়, পর কেউ নেই, তিনি এক।'' এই ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। এতে মৃতের আত্মীয়দের শোক কিছুটা প্রশমিতও হল।

তারপর সেই মৃতদেহের সৎকারকার্য শেষ ক'রে স্নান তর্পণাদি সেরে মৌনী ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে রাজা সেই মুনিদিগের চরণবন্দনা করলেন। দেবর্ষি নারদ প্রীত হ'য়ে বললেন, ''তোমাকে একটি মন্ত্র দিচ্ছি, যদি তুমি সংযত চিত্তে তা ধ্যান করতে পার, তাহলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যাঁর শরণাপন্ন হ'য়ে অতুলনীয় মহিমা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তুমিও অচিরেই সেই ভগবান্ বিষ্ণুদেবকে লাভ করতে পারবে।'' এই ব'লে নারদ রাজাকে মন্ত্রোপদেশ করলেন এবং অঙ্গিরার সঙ্গে ব্রহ্মালোকে গমন করলেন।

দেবর্ষি নারদের আদেশ মত সাতদিন জলমাত্র পান ক'রে রাজা চিত্রকেতু সংযতভাবে ঐ বিদ্যা ধ্যান করলেন। সাতটি রাত পার হলে ঐ বিদ্যার প্রভাবে স্বয়ং ভগবান্

বিষ্ণুর সাক্ষাৎ দর্শন পেলেন চিত্রকেতু। বিষ্ণুর সেই অলৌকিক রূপ এবং প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি দেখে শ্রদ্ধায়, আনন্দে, বিগলিত চিত্তে তিনি ভগবানের পাদপক্ষে শরণ নিয়ে ভক্তিভরে নানা স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। রাজার স্তবে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ তাঁকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ ক'রে বললেন—''তুমি এই ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা ক'রে অচিরেই জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন হ'য়ে সিদ্ধিলাভ করবে।" এরূপ আশীর্বাদ ক'রে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

এই আশীর্বাণী লাভের পর এক সময়ে বিমানে আকাশপথে ভ্রমণ করতে করতে চিত্রকেতু দেখতে পেলেন মুনিগণের সভামধ্যে দেবাদিদেব মহাদেব সিদ্ধচারণে পরিবৃত এবং ভবানী তাঁর ক্রোড়রতা। এই দেখে মহাদেবের সামনেই চিত্রকেতু উপহাসের সঙ্গে বললেন, ''ইনি একজন লোকগুরু, সাক্ষাৎ ধর্মবক্তা! তাতে আবার কঠোর তপস্বী, ব্রহ্মবাদী ও এই সভার সভাপতি! নীচ ব্যক্তিরাও জনসমক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হ'তে সঙ্কোচ বোধ করে আর ইনি তো বেশ প্রকাশ্য সভামধ্যেই তা আচরণ করছেন!"

চিত্রকেতুর এই সকল কথা পার্বতীর কানেও গেল। তিনি রোষভরে তাকে বললেন—''আজকাল তুমিই দেখছি লোকমধ্যে শাস্ত্রবিধির নিয়ামক হয়ে উঠেছ? আমাদের মত নির্লজ্জগণের শাস্তিদাতা ও দণ্ডধর প্রভু বুঝি কি শুধু তুমিই? ব্রহ্মাদি সকলেই এখন শাস্ত্র ভুলতে বসেছেন! কারণ, মহাদেবের তো তাঁরা কেউ দোষ ধরেন না! এ তোমার উপযুক্ত স্থান নয়, তুমি দানবযোনিতে গিয়ে জন্মগ্রহণ কর।"

এইভাবে পার্বতীর দ্বারা চিত্রকেতু অভিশপ্ত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ বিমান থেকে নেমে দেবীর ক্রোধ উপশমের জন্য চেষ্টা করতে থাকলেন এবং বললেন— ''দেবি! অভিশাপ, অনুগ্রহ, স্বর্গ, নরক, সুখ-দুঃখ—এ সকলই সমান। এর মধ্যে কোনটাই আকাঙ্ক্ষার বা দ্বেষের বিষয় নয়। আপনি আমার কথাগুলিকে অসাধু ব'লে মনে করেছেন, আমার সেই অপরাধটুকু ক্ষমা করুন। মাতঃ! আমি শাপভয়ে ভীত হয়ে আপনাকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করছি না, বরং আপনার অভিশাপ আমার শিরোধার্য। শুধু এইটুকু প্রার্থনা, আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না।" এই অনুনয় জানিয়ে চিত্রকেতু বিমানপথে চলে গেলেন।

ভগবান্ রুদ্রদেব তখন পার্বতীকে বললেন— ''অদ্ভুতকর্মা হরিভক্ত মহাত্মাদের মাহাত্ম্য সত্যই অদ্ভুত! প্রকৃত হরিভক্তগণ যে কোন কিছুতেই ভীত হন না; স্বর্গ, নরক, মুক্তি সবগুলিকে সমান নিষ্প্রয়োজন ব'লে মনে করেন—এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই চিত্রকেতু। হরির প্রিয় এই অনুচর সর্বদাই শান্ত ও সর্বত্রই সমদর্শী। এজন্য আমার এ ব্যক্তির উপর কোন ক্রোধ নেই।" মহাদেবের এই কথায় ভগবতী পার্বতী কিছুটা সুস্থচিন্তা হলেন।

পার্বতীর এই অভিশাপবশতঃ চিত্রকেতুই পরে দানবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সে জন্মে তাঁর নাম হয় বৃত্র। ইনিই সেই প্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত দানব বৃত্রাসুর, যাঁর প্রতাপে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবঋষিগণ একদিন কম্পিত হয়েছিলেন।

সংকলক ঃ কিঙ্কর সামানন্দ।

আনন্দ সংবাদ

শ্রীগুরুপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সর্বাধীশ শ্রীমৎ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজজী মহারাজ বিরচিত 'Be Tension Free' মূল ইংরাজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'উদ্বেগের অবসান' আত্মপ্রকাশ করবে। ওঙ্কারনাথ মিশনের উদ্যোগে উক্ত গ্রন্থের ইংরাজী ও হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত।

ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশের পরে বহু ভক্ত, অনুরাগী, বিদ্বজ্জনের বারবার অনুরোধে এই অনুবাদ এখন প্রকাশিত হচ্ছে। বহু মানুষ এই গ্রন্থের সাহচর্য্যে উপকৃত হবেন ও আনন্দ পাবেন।

জীবন খাতার পাতায় পাতায়

শ্রী জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়

(২)

স্মৃতিই জাগায় স্মৃতি। স্মৃতির সরণী ধ'রে অতীতের পথে চলতে চলতে কত জিনিস যে চোখে পড়ে! অতীতে যা ঘটা...বর্তমানে তা ফিরে দেখা—দেখা মনের চোখ দিয়ে। পূর্বে বলেছি জীবনের কত ঝড় দুর্যোগের আঁধার রাত পেরিয়ে আমার বাবা-মা ঠাকুরের শ্রীচরণের আশ্রয়ে এলেন। এরপর আমাদের সংসার তরণী ছেঁড়াপাল-ভাঙ্গাহাল অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সংসার সমুদ্রে হেলেপড়া তরণীটি আবার সোজা হয়েছে। আমার পড়াশুনায় পূর্ণচ্ছেদ পড়তে পড়তেও মুছে গেছে ঠাকুরের কৃপায়। সুতরাং আমি আবার ফিরেছি স্কুলের পরিমণ্ডলে। এবার যিনি সংসার তরণীটির হাল ধরলেন তিনি দক্ষহালী, শুধু দক্ষ বললে ভুল হবে, মহাদক্ষ। জীবনের হাল ধ'রে পারাপার করিয়ে দেওয়াই তাঁর কাজ।

ওঁদের দীক্ষার পর থেকেই ঠাকুর ওঁদের তাঁর কঁপা সান্নিধ্য দিতে থাকেন, একথাও পূর্বে বলেছি। এইসময় একবার আমাদের পুরীতে যাওয়া হল ঠাকুর দর্শনে। তিনি তখন নীলাচল আশ্রমে অবস্থান করছেন। ভক্ত সমাগম কম চলছে তখন। সেবার আমরা উঠেছিলাম আমার মা'র সম্পর্কে এক দিদির কাছে নুলিয়া সাই-এ। একটি ছোট দোতলা বাড়ী, ওপরে খানদুয়েক ছোট ছোট ঘর সম্ভবতঃ সেখানে তাঁর পরিচিত জন এলে থাকার ব্যবস্থা হত, আর নীচে একটা ঘরে তাঁর সেবিত গোপাল বিগ্রহ নিয়ে তিনি একা থাকতেন। ছোটখাটো রোগা রোগা শরীর, মাথায় দুধসাদা ফেনা। বয়স তখন তাঁর ১০৫ বছর শুনেছিলাম। বয়স অনুযায়ী বেশ কর্মঠ, তবে ধীরে ধীরে চলতেন ফিরতেন। কথা আস্তে আস্তে বলতেন—কণ্ঠস্বরটি কোমল, কথাগুলি মিষ্টি। গোপালের সামান্য ভোগ তিনি নিজেই রান্না করতেন। পরণে একটি সাধারণ কাপড়—গেরুয়া মনে হয়নি, তবে গৈরিক আভা ছিল। হ'তে পারে একা বৃদ্ধা, কর্মক্ষমতা কম, দীর্ঘ ব্যবহারে রঙচটা পরণের কাপড়গুলিকে পুনরায় রঙে চুবিয়ে নিতে পারেন নি। পুরীতে তিনি পুরীর সাধুমা নামে পরিচিত। আমাদের ঠাকুরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে এই সাধুমার যোগাযোগও ছিল। একথা পরে জেনেছি ও দেখেছি। সে কথা যথাস্থানে আসা যাবে। এখন এঁর সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি, অর্থাৎ আমার মা-বাবাকে তিনি নিজে যতটুকু বলেছিলেন, সেটি আগে বলি।

সাধুমা পুরী এসেছিলেন একা পায়ে হেঁটে জলাজঙ্গল পাহাড় পার হয়ে। পুরীতে রেল যোগাযোগ তিনি দেখেন নি সেসময়। সমুদ্রের জল তখন এখনকার মতো পাকা রাস্তা থেকে ঐ লম্বা বেলাভূমি ছাড়িয়ে অত দূরে ছিল না। এখনকার ঐ পাকা রাস্তাও ছিল না। সমুদ্রের জল তখন ছিল এখনকার ঐ পাকা রাস্তা বরাবর। পুরীতে এসেছিলেন সাধুমা সাধনা করতে। কারও শিষ্যা ছিলেন তিনি, শুনিনি। রোজ দুবেলা আমরা ঠাকুরের আশ্রমে যেতাম। এর ফাঁকে একদিন তাঁর সাধনার স্থানটি আমাদের দেখাতে নিয়ে গেলেন। জায়গাটির নাম জানা নেই। স্থানটি নির্জন, মাঝে মাঝে পাখিপাখালির কিচিরমিচির আর বাতাসে আন্দোলিত গাছের পাতার মৃদুমন্দ শব্দ ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। মানুষজন চোখে পড়ে নি। স্থানটি শুধু নির্জনই নয়, জঙ্গলাকীর্ণও বটে। রোদ ঝলমল দুপুরবেলাতেও সেখানে যেন আসন্ন সন্ধ্যার আবছা আঁধার। সাধুমা এরমধ্যে তাঁর সাধনপীঠটি দেখালেন, বললেন, ঐ স্থানে ভোর রাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একা বসে জপ করতেন এবং ঐখানেই শেষে দর্শন হয় তাঁর। ফেরার পূর্বে তিনি একটি জালার মতো পরিত্যক্ত মাটির পাত্রে থাকা জল থেকে আঁজলা ক'রে জল নিয়ে পান করতে বললেন। শুনলাম খুব পবিত্র ঐ জল। কিন্তু আধার ও আধেয়র

শ্রমনই অবস্থা ভক্তিভরে ঐ জলপানের ইচ্ছা হয় না। সময়ের ছাপে ও চাপে জালাসাদৃশ্য আধারটি দেখলাম অত্যন্ত মলিন ও পুরাতন, কিছুটা ভগ্নও বটে। জল সেই ভগ্নাংশের মধ্যেই। সবুজ শেওলার অধিকার তার সর্বত্র। জল স্পষ্টতই বহুদিনের ধরা বা জমাজল, কালচে কালচে ভাব। মনে হল পচা দুর্গন্ধময় জল, খেলে নির্ঘাত অসুখ। আমার নাকসিটকানো ভাব দেখেই বোধহয় সাধুমা আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'কিছু হবে না, খেয়ে নাও। দেখ আমিও খাচ্ছি'—ব'লে নিজেও একগণ্ডুষ জলপান করলেন। আমার বাবা-মা ভক্তি সহকারে সেই জলপান করলেন দেখে আমাকেও তাই করতে হল। দেখলাম, জল পচা দুর্গন্ধযুক্ত পানের অযোগ্য নয়। সত্যিই আমাদের কোনও শরীর খারাপ হয় নি ঐ জল খেয়ে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে সাধুমা আমার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা গুরুদেবের শ্রীচরণে ফুল দিয়ে গুরুপূজা করেছেন কিনা। আমাদের আশ্রমে এরকম আলাদাভাবে প্রত্যেকের শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে ফুল দিয়ে গুরুপূজা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বাবা সাধুমাকে যথাযথ উত্তর দিলেন। কিন্তু সাধুমা সে কথায় কান দিলেন না। সে কি সীতারামের মতো যাদের গুরু তারা এত দূরে এসে ঠাকুরকে পেয়েও তাঁর শ্রীচরণে ফুল দিয়ে গুরুপূজা করে নি। এখন মনে হয় সাধুমা শ্রীগুরুচরণে ফুল দিয়ে প্রণাম করার কথাই বলতে চাইছিলেন, আক্ষরিক অর্থে গুরুপূজা নয়। যাইহোক, তিনি এ উত্তর নিতে নারাজ। গুরুপূজা করতেই হবে। এতদূর এসে গুরুসঙ্গ করে গুরুপূজা না করে বাড়ী ফেরা যাবে না। সুতরাং তাঁর ভাবনা তিনি অবিলম্বে কার্যকরী করতে উদ্যোগী হলেন, তখন দুপুরবেলা। সাধুমা বললেন, 'এখনি চলো আশ্রমে।' সুতরাং তাঁকে নিয়ে পুনরায় ঠাকুরের নীলাচল আশ্রমে ফিরে আসা হল। জানা গেল ঠাকুর সেই সবে ভোগান্তে তাঁর বিশ্রামঘরে গিয়েছেন, সুতরাং দরজা বন্ধ। তাঁর দর্শন লাভের উপায় নেই সেইসময়।

সাধুমা অতি বৃদ্ধা। আগেই বলেছি যে তাঁর বয়স তখন ১০৫ বছর শুনেছি। সুতরাং আশ্রমের ছেলেদের কথা তাঁর কানে ঢুকলো কি ঢুকলো না বোঝা গেল না। তিনি এগিয়ে চললেন ঠাকুরের বিশ্রামঘরের দিকে, একহাতে আমার মা'র হাত ধরা, অন্য হাতে বাবার হাত ধরা। 'গোপাল, আমার গোপাল কোথায়?' বারংবার বলতে বলতে এগিয়ে চললেন। আমরা যখন ঠাকুরের ঘরের বন্ধ দরজার কাছাকাছি এসে পড়েছি ঘরের দরজা খুলে গেল, ঠাকুর বেরিয়ে এলেন মধুরহাসি নিয়ে। 'এই যে তোমার গোপাল, এই যে তোমার গোপাল'—বলতে বলতে ঠাকুরটি ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে জড়িয়ে ধরলেন সাধুমাকে। মা ছেলের মধুর মিলন। তারপর ঠাকুর ধীরে ধীরে অতি যত্ন সহকারে সাধুমাকে নিয়ে এসে বসালেন ঘরে নিজের পাশে। আমরাও প্রণাম করে ঠাকুরের সম্মুখে কাছাকাছি বসলাম। ঠাকুরের সঙ্গে সাধুমার কুশল বিনিময় চলল কিছুক্ষণ। একসময়ে সাধুমা আমাদের নিয়ে তাঁর কাচে ঐ সময়ে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। ঠাকুরটি হেসে সম্মতি জানালেন এবং তাঁর শ্রীচরণ বাবা-মা'র দিকে প্রসারিত করে দিলেন। সাধুমা ওঁদের উদ্দেশ্যে বললেন 'নাও, এবার গুরুদেবের শ্রীচরণে ফুল দিয়ে প্রণাম কর।' শ্রীচরণে ফুল দিয়ে প্রণাম হল। ঠাকুরের করুণাধারায় আমরা স্নাত হলাম। এবার সে বেলার মতো ফিরে আসবার পালা আশ্রম থেকে, ঠাকুরটিও বিশ্রামে যাবেন। সুতরাং আমরা উঠে পড়লাম। ঠাকুরটিও উঠলেন, সাধুমাকে ধরে ধরে বিশ্রামঘর থেকে কিছুটা এগিয়ে দিলেন। আমরা ফিরে এলাম সাধুমার আস্তানায় নুলিয়া সাই-এ।

এবার আর একদিনের কথা। বাবা-মা, আমি ও আমার বোন বসে আছি ঠাকুরের ঘরে। ঠাকুর বসে আছেন তাঁর কম্বলাসনে। তাঁর শ্রীচরণটি প্রসারিত আমাদের দিকে। ঘরে সেইসময়ে অল্প কয়েকজন ভক্ত সম্ভবত ২-৩ জন আছেন। সকলেই চুপচাপ। ঠাকুর মাঝেমাঝে এর-ওর সঙ্গে দু-একটি কথা বলছেন। আর সকলে শুনছেন। বাবা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠতে লাগল মুহূর্মুহু। চোখ বন্ধ হল, সেখান থেকে বইতে লাগল অশ্রুধারা অজস্র ধারায়। সারা দেহ তাঁর থরথর করে কাঁপতে লাগল, তাঁর বাহ্যজ্ঞান চলে গেল, তিনি সেই অবস্থায় লুটিয়ে পড়লেন ঠাকুরের শ্রীচরণে। ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি তখন বাবার ওপর। বাবার

মাথায় তিনি তাঁর শ্রীহস্ত স্থাপন করলেন, বাবার ঐ ভাবটি স্থির হল তিনি সম্বিত পেয়ে উঠে বসলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে মৃদু হাসি। এবার তাঁর সঙ্গে দু-চারটি কথার পর আমাকে দেখিয়ে ঠাকুরটি বাবাকে বললেন—'ছেলের পৈতা দিস্‌নি কেন?' উত্তর তো তাঁর অবিদিত নয়। তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয়লাভের পূর্বে বাবার রহস্যময় রোগ নিয়ে (যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে) গোটা পরিবারটির ওপর দিয়ে যে কি তুফান-ঝড়-বাদল চলেছিল, যার ফলে আমার লেখাপড়ারও ইতি হতে বসেছিল সেসব কথা তো অন্তর্যামী ঠাকুরটি সবই জানতেন। তাই বাবার উত্তরের অপেক্ষা না করে ঠাকুরটি পুনরায় বললেন—'এবার ছেলেটার পৈতা দিয়ে দে।' প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সেবার পুরী থেকে ফেরার পর আসার উপনয়ন হল। পূর্বে ঘটনায় ফিরে আসি।

বাবাকে আমার পৈতার নির্দেশ দিয়ে ঠাকুরটি এবার আমার দিকে তাকালেন। সেদিন আমি আবার হাফপ্যাণ্ট পরে তাঁর সামনে বসে আছি। পরবর্তীকালে দেখেছি প্যাণ্ট পরে তাঁর কাছে কেউ গেলে কত সময় বকাবকি করেছেন। কোন কোন সময় তাঁকে লজ্জা দেওয়ার জন্য হ্যাণ্ডসেকের নিমিত্ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেদিন ঠাকুর আমাকে বা আমার বাবা-মাকে বকলেন না। পরিবর্তে আমার দিকে ফিরে কোমল কণ্ঠে প্যাণ্ট পরার অপকারিতার কথা বলতে লাগলেন, তারপর বললেন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা কেন উচিত নয়—প্রস্রাবের ধারা বাঁদিকে পড়লে কি অন্যায় হয়, ডানদিকে পড়লেই বা কি হয়। এর ফাঁকে একজন রসিকতা করে খুব আস্তে আস্তে যাতে ঠাকুরের কর্ণগোচর না হয় এমনভাবে হেসে স্বগতোক্তি করলেন, যদি প্রস্রাবের ধারা সোজা পড়ে তাহলে কার মুখে পড়বে? এরপর ঠাকুর বললেন, কানে পৈতা দিয়ে প্রস্রাব করার প্রয়োজনীয়তার কথা। প্যাণ্ট পরে ঠাকুরের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে আর একটি কথার উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানি। পরবর্তীকালে জীবনে আমাকে দুবার বাধ্য হয়েই প্যাণ্ট পরা অবস্থায় ঠাকুরের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সে ছিল আমার জীবনের বড় মধুর স্মরণীয় মুহূর্ত। ঠাকুরটি সবকিছু হৃদয়ঙ্গম করেই আমার প্যাণ্টের দিকে তাকাননি।

এবার জীবনস্মৃতির দৃশ্যপট পরিবর্তন। স্থান, শ্রীরামপুর, চাতরা—আমাদের আশ্রয়স্থল যেখানে ঠাকুরটির শ্রীচরণ বহুবার পড়েছিল আমাদের সকলকে কৃতার্থ করবার জন্য। এবার একটি ছোট ভাষা-চিত্র রাখি আমাদের সেই সময়ের বাসস্থানের। 'সেই সময়ের' বললাম কারণ বর্তমানে আমরা একই অঞ্চলে অন্যত্র থাকি সেখানেও ঠাকুরের কৃপাপরশ লাভে ধন্য হয়েছি অনেকবার। যাইহোক, আমাদের সেই বাসস্থান ছিল একটি সুবৃহৎ বাড়ী, বয়সের ভারে জরাগ্রস্থ। শরিকীবাড়ী। আমার বাবারা পাঁচ ভাই সেই বাড়ীর অংশীদার, আমার বাবা ছোটভাই। সুতরাং আর সকলেই আমার জ্যাঠাইমা-জ্যাঠামশাই। আমার বাবা নির্মলচন্দ্র-র ঠিক ওপরের ভাই আনন্দলাল, আমার ছোট জ্যাঠামশাই যাঁর ছেলে শ্রীমান অশোক যার কথা পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি। আমার থেকে অল্প বড়, আমারই মতো স্কুলের ছাত্র তখন, তবে উঁচু শ্রেণীর। পরস্পর আমরা জাড়তুতো, খুড়তুতো ভাই হলেও সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। তার মা আমার ছোট জ্যাঠাইমা। এই দুই পরিবারকেই ঠাকুর প্রথম কৃপা করে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় দেন এবং এই দুই ভাইয়ের (অশোক ও জয়ন্ত) প্রার্থনাতেই বারংবার ঠাকুরের কৃপাগমন ঘটত বাড়ীতে।

এইসময় বাড়ীতে এক সাধুমূর্তির আবির্ভাব হল। গেরুয়া বসন, ফর্সা রং, স্বাস্থ্যবান, মাঝারি চেহারার বেহ তেজীয়ান মানুষ। প্রায় মধ্যরাতে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা। এবার তাঁর কথাই বলব। শুরুও বলব, শেষও বলব কারণ একসময় আমাদের জীবনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কিছুদিন এবং ঠাকুরের স্মৃতিচারণায় তাঁর কথা বাদ দেওয়া সঙ্গত হবে না। কেন যাবে না, তা যথাসময়ে পরিস্ফুট হবে।

-ক্রমশঃ

স্মরণে

বিনম্র স্মরণে

কিঙ্কর সমীরণ

আমার সঙ্গে আণ্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে! বললেন, কিঙ্কর বিদ্যানন্দজী। চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করছে। রিমলেস ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে কাঁচের মত চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করছে। কপালের তিলক জানান দিচ্ছে ইনি শ্রীভগবানের সেবক। গায়ে একটা পাতলা সিল্কের নামাবলী। ঠোঁট দুটো আবেগে থরথর করে কাঁপছে। শিশুসুলভ চঞ্চলতা সারা শরীরে। ভেতরের উচ্ছ্বাস টগবগ টগবগ করছে। বলতে চাইছেন কিছু একটা। বলি বলি করছেন কিন্তু বলতে পারছেন না। খুব আনন্দ হচ্ছে কিঙ্কর বিদ্যানন্দজীর (ড. নির্মল কুমার পাণিগ্রাহী)। সমসাময়িক গুরুভায়েরা তাঁকে ডাকতেন পাণিদা বলে। আদি নিবাস ছিল উড়িষ্যায়।

পরবর্তীকালে পূর্বপুরুষেরা চলে আসেন মেদিনীপুরে। একটা ছটফটানি ভাব। কিঙ্কর অতুলানন্দজীর হাত দুটো ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন শ্রীরাম-জানকী-লক্ষ্মণজীর বিগ্রহের দিকে।

অতুলানন্দজী নীরবতা ভাঙ্গলেন। বললেন, আরে আণ্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি হল বলুন? কার সঙ্গেই বা হল?

দুজনেই হাসছেন। এ হাসির অর্থ খুঁজতে চাওয়া বোকামী। এ হাসির কোন ডেফিনেশন দেওয়া যায় না। অতুলানন্দজী বুঝতে পারছেন, একটা আইডিয়া করছেন তবু সংশয় কাটছে না। স্বয়ং রামজীর সঙ্গে আণ্ডারস্ট্যান্ডিং! তাও আবার আজকের যুগে? কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন আবার।

-পাণিদা, আণ্ডাস্ট্যান্ডিংটা কি হল একবার বলুন, না হলে আমাদের সংশয় কাটে কি করে?

এদিকে পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। শুরু হল আরতি। দুজন দুদিকে। মাঝে শুধু স্মিতহাস্যে রাজার ছেলে রামচন্দ্র। পাণিগ্রাহীদার শ্রীরামজী।

পাণিগ্রাহীদা শ্রীরামজীর দিকে তাকিয়ে আছেন আর রস আস্বাদন করছেন। আর অতুলানন্দজীরও ভেতরটা উসখুশ করছে। ভাবছেন, সত্যিই কি রাজার ছেলের সঙ্গে পাণিদা'র কোন কথা হয়? কোন কথা হয়েছে?

প্রণাম নিবেদনের পরে বিদ্যানন্দজী অতুলানন্দজীকে জিজ্ঞেস করলেন, দেখতে পাচ্ছেন? ঐ দেখুন, রামজী কেমন হাসছেন?

-আপনাদের চোখ আছে, আপনারা ঐসব হাসিটাসি দেখতে পান, আমরা ব্যবসাদার মানুষ, আমাদের হাতে-গরম চাই। পাণিগ্রাহীদার কোনোদিকে মনোযোগ নেই। শুধু হাসছেন আর হাসছেন। ভাবটা যেন এইরকম 'রাজার ছেলে রামচন্দ্র' ওদের কথাগুলো বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন।

-কই, কিছু বললেন না তো?

-কোনটার কথা বলছেন?

-ঐ যে কি একটা আণ্ডারস্ট্যান্ডিং এর কথা বলছিলেন।

-রামজী আমার শেষ কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ শরীরটার দাহ কাজ-এর দায়িত্ব রামজীর।

-ধুস্! তাই কখনও হয়?

-বয়স কত হল?

-কার আমার? এই চুয়াত্তর।

-আমার থেকে দু'বছরের ছোট। দেখে নেবেন— রামজী কথা দিয়েছেন।

তারপর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। বিড়্‌বিড়্ করতে যাচ্ছেন—

''ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ঠে ভার্য্যা গৃহদ্বারে
জনা শ্মশানে দেহ চিতায়াং পরলোকমার্গে

ধর্মানুগো গচ্ছতি জীব একা।"

যদি ধর্ম পালন না করো তবে প্রকৃতি তোমাকে দিয়ে পাপ করাবে। প্রকৃতি কখনও পুণ্য করায় না। পুণ্য করতে হলে চাই পুরুষার্থ।

মৃত্যুর সময় টাকাপয়সা সব পড়ে রইলো। আত্মীয়স্বজন কেউ এসে পৌঁছাতেও পারলেন না। বন্ধু, প্রতিবেশী সব শ্মশান পর্যন্ত গেলেন কিন্তু ধর্ম—সেই শেষপর্যন্ত সঙ্গে যায়—।

খবরটা এল দিল্লী থেকে। রাত গভীর হতে তখনও একটু বাকি আছে। শুক্লপক্ষ, নবমীতিথি, রাত ৮-১১ মিঃ, শনিবার, ৭ই জুন, ২০১৪ ওঙ্কারলোকে পাণিগ্রাহীদা চলে গেলেন। খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে ওঙ্কারনাথ মিশনের গাড়ী ছুটল ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে। সামনেই রয়েছেন ওঙ্কারনাথ মিশনের আচার্য্য, অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সহ-সর্বাধীশ কিঙ্কর সামানন্দজী, ওঙ্কারনাথ মিশনের সর্বভারতীয় সম্পাদক শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বর জয়গুরু মঠের অধ্যক্ষ কিঙ্কর অশোকানন্দজীসহ আরও বেশ কিছু সেবক। কোন কথা নেই। গাড়ী ছুটছে তো ছুটছেই। অন্ধকার ভেদ করে গাড়ী তিরবেগে ছুটে চলেছে।

তখনও চোখে ঢুলুনি আসেনি। ভাবছি, এই গাড়ী যত জোরেই যাক্ আগামীকাল পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ওদিকে কানপুর থেকে অমল নিয়োগী আসছেন। উনিই বর্তমানে অযোধ্যা আশ্রম পরিচালক কমিটির সম্পাদক। সঙ্গে আসছেন অশোক বাজপেয়ী।

আজ কেবলি পাণিদা'র মুখটা ভেসে উঠছে। সেই গায়ে সিল্কের চাদর, কপালে ঊর্দ্ধপুণ্ড। রিমলেস চশমা। ভাবছি রামজী ওঁর দাহ কাজটা করলেন কোথায়? সন্ধ্যের পর রাত ৮টা ১১মিঃ এ দেহ ছেড়ে দিয়েছেন। এ তো দেখছি আগামীকালও দাহ কাজ হবে কিনা সন্দেহ। ভাবতে ভাবতেই দেখি কে একজন পাশ থেকে প্রসঙ্গটা তুলল, অযোধ্যায় নাকি সন্ধ্যার পর শ্মশানে দাহ করতে দেয় না? চিন্তা বেড়েই চলেছে। দাহ কখন হবে, কীভাবে হবে, কোথায় হবে? এর মধ্যেই দুর্গাপুর থেকে উঠলেন অমলেশ ব্যানার্জী। প্রত্যেকের মোবাইলগুলো ঝন্‌ঝন্ করছে। এক একটা ফোনের এক একরকম শব্দ। কেউ বলছেন, বরফের স্ল্যাব কিনে লাগিয়ে দাও, কেউ বলছেন, অ্যাই তুই নেট থেকে ফৈজাবাদের এস.পি'র ফোন নাম্বারটা দে। কেউ বলছেন একটু অপেক্ষা করো আমরা সবাই খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব। ওঙ্কারেশ্বর থেকে বিঠ্ঠলজী সমস্ত ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। না থেকেও তিনি আছেন সব সময় আমাদের সঙ্গে।

ধানবাদে একটা পেট্রোলপাম্পে গাড়ীটা দাঁড়াল। তেল নিতে হবে। ইত্যবসরে ওখানেই আমরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলাম। গরমের ভয়ে স্নানটাও কেউ কেউ সেরে নিলেন। আবার গাড়ী ছুটছে। বেচারা ড্রাইভারজী! দু-চোখের পাতা একবারের জন্যেও এক করতে পারেনি। বেনারসে আমাদের কাশী রামাশ্রমে প্রসাদ নেবার জন্যে বলে দিলেন বিঠ্ঠলজী। গাড়ীটাকে পার্কিং এ রেখে অনেকটা রাস্তা হেঁটে আশ্রমে ঢুকলাম। পাতা, আসন সব রেডি। শুধু দশহরা বলে কাশীর গঙ্গায় ডুব দিয়ে প্রসাদ পেতে বসে যাওয়া হল। উমানন্দজী সব ব্যবস্থা করেই রেখেছিলেন। কে একজন বললেন, এ বড় কঠিন ঠাঁই গুরুশিষ্যের দেখা নাই। মানে কি? উত্তর ভেসে এল 'আলু-পটলের' কোনো দেখা নেই। শুধু বাবা রামদেব আছেন। লাউ আর কচকচে বাঁধাকপি। তখন সেটাই অমৃত! বাইরে বেরুতে প্রাণ চাইছে না। প্রায় ৫৫ ডিগ্রী টেমপারেচার। সমস্ত শরীর ঝলসে যাচ্ছে। শুধু ভাবছি হে রামজী আপনি যখন পাণিদা'র সঙ্গে আণ্ডারস্ট্যান্ডিং করেই ছিলেন, তাহলে এখন দাহ কাজটি সম্পূর্ণ করে দিলেই তো পারতেন।

পুলিশ থেকে লোকনাথদা'কে ফোন করছে আমরা কোথায়, কত দূরে আছি, জানতে চাইছে আর কত দেরী? চ'ল, চ'ল...। গাড়ী ছুটছে। খবর হল অমলদা ঢুকে গেছেন। বসন্ত গুরুজী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন। কেনাকাটা সব কমপ্লিট। শুধু আমরা পৌঁছুলেই...।

বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে পৌঁছে গেলাম আশ্রমে। স্থানীয় লোকেরা সব বাড়ী চলে গেছে। গোটা আশ্রম ডুবে

গেছে অন্ধকারে। বিগ্রহেরা সব উপবাসী আছেন। লোডশেডিং চলছে। ঠাণ্ডা জলের স্রোত বইছে সিঁড়ি দিয়ে। আবার টেম্পোয় করে বরফের স্ল্যাব এল। আলোচনায় ঠিক হল ভোর না হতেই শেষযাত্রা শুরু হবে—কিঙ্কর বিদ্যারত্ন শুয়ে আছেন হিমশয্যায়। প্রায় ছ'খানা কম্বল দিয়ে ঢাকা। কোনোরকমে মোমের নরম আলোয় ওঁর মুখখানা দেখলাম।

খবর এল এক্ষুণি পুলিশের বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আবার নয়াচৌকী পুলিশ স্টেশন।

অতবড় মন্দিরের করিডরে ৩টে চৌকীপাতা। কয়েকটা আগেকার দিনের কাঠের চেয়ার। যে যার মত করে সব বসে আছেন। এমনকি বাঁদরগুলো আজ তাদের বাসায় ফিরে যায়নি। লোহার জালগুলো ধরে চুপচাপ বসে আছে। নৈঃশব্দের গভীরে শুধু ওদের চোখগুলোই জ্বলছে। একজন বললেন, ব্যাটারা সিদ্ধিগাছের ফুল খেয়ে কেমন ঝিমুচ্ছে। আর একজন বললেন, না, ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের প্রিয়জন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আর সে এই মন্দিরে ফিরে আসবেন না। তাই ওরা কাল থেকেই নীরবতা পালন করছেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে থাম্বার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে ভাবছি, কই রামজী তো এলেন না? একটু ঝিমুনীর মধ্যেই লীলা স্মরণ হয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর বর্ধমানের খণ্ডকোষে গেছেন নাম প্রচারে। উঠেছেন পরিতোষ সরকার দাদাদের বাড়ীতে। সঙ্গে রয়েছেন মুকুন্দদাদা। শিবমন্দিরে গ্যাসবাতি জ্বলছে। তারই মধ্যে ঘুরে ঘুরে নাম চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে সমাধিস্থ হয়ে যান। ৩দিন এখানে ছিলেন। ওখানে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের মন্দির আছে। পাঁচ চূড়াওয়ালা। বিশাল অতিথিশালা, ভোগঘর—সব বন্যায় নদীগর্ভে চলে গেছে। তখনও কিছুটা রয়েছে। শ্রীনাম নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠলেন মন্দিরে। ধ্যান করতে গিয়ে আবার সমাধিস্থ। সমাধিভাঙ্গার পরে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে নাটমন্দিরের চাতালে বসলেন। পুরোহিত ছিলেন ব্রজ ভট্টাচার্য্য। তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন—মন্দিরের এরূপ ভগ্নদশা কেন?

ব্রজ ভট্টাচার্য্য বলতে লাগলেন, এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কালুরাম মজুমদার। বর্ধমান মহারাজার অধীনে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। যে সব জমিদার রাজার খাজনা দিতে পারত না এই কালুরাম তাদের সে সব জমিদারী কিনে নিত। নীলামে কিনত। কিন্তু কোনো জমিদারী নিজের নামে কেনেন নি, কিনতেন শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের নামে। প্রচুর অর্থের মালিক যেমন হয়েছিলেন তেমনি গ্রামের লোকেদের জন্যে জনহিতকর কাজও অনেক করেছিলেন। এদিকে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ রটিয়ে দিল রাজকোষ থেকে কালুরাম চুরি করে ধনী হয়েছে। রাজ পেয়াদা এসে কালুরামকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্দী করে রাখে। লজ্জায় অপমানে কালুরাম রাজ কারাগারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শহর থেকে দেহ এল গ্রামে। মন্দিরের পূবদিকে একটা দীঘি কাটান হচ্ছিল গ্রামেরই মানুষদের জন্য। সেই দীঘির মাঠে চিতা সাজান হল। গুঞ্জন উঠল কালুরাম তো অপুত্রক, কে ওর মুখাগ্নি করবে? অধিকাংশ গ্রামবাসী তখন কালুরামের শত্রু। সন্ধ্যা হয়ে এল।

মন্দিরের দরজা খুলেছেন পুরোহিত। হঠাৎ দ্যাখেন কি রাধাবল্লভজীর বাঁশীটা পড়ে আছে সিংহাসনে, আর হাতে আধপোড়া কুঁচীকাঠির গোছা। পুরোহিতের তো হতভম্ব অবস্থা। ভাবছেন ঠিক দেখছি তো! রাধাবল্লভজীর হাতে কুঁচিকাঠির গোছা কোথা থেকে এল? এমন সময় পুবের মাঠ থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। পুরুতমশায় চিতায় আকাশ থেকে আগুন জ্বলে উঠেছে!

আগুন! আগুন! আকাশ থেকে আগুন নেমেছে। সেই শুনে পুরোহিত মশাই তো জ্ঞানহারা।

আজও সেই দীঘি তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য দেবে বসে আছে। তবে নামটা তার বদলে গিয়ে হয়ে গেল প্রাণহারালী। যেহেতু এই দীঘিটা কাটাবার সময়ই কালুরামের মৃত্যু হয় তাই নাম হয়ে গেল প্রাণহারালী বা অপশু সে পরালী।

ঝিমটা কেটে গেল। খুব আস্তে রেকর্ডেড নাম

বেজেই চলেছে।

বসে বসে ভাবছি এই সেই অযোধ্যা। কোটি কোটি হিন্দু বিশ্বাস করেন এখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোনো হিন্দুই বিশ্বাস করেন না যে ভগবান মসজিদের ভেতরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্কন্দ পুরাণে আছে—

''জন্ম স্থানমিদং প্রোক্তং মোক্ষাদিফল সাধনম্।
বিঘ্নেশ্বরাৎ পূর্বভাগে বশিষ্ঠাৎ উত্তরে তথা।
লোমশাৎ পশ্চিমে ভাগে জন্মস্থানং ততঃ স্মৃতম্।''

অযোধ্যার বিঘ্নেশ্বর মন্দিরের পূর্বে, বশিষ্ঠকুণ্ডের উত্তরে ও লোমশ তীর্থের পশ্চিমে মোক্ষফলদায়ি রামজন্মভূমি অবস্থিত।

আসলে 'অযোধ্যা' শব্দটাই এক মন কেমন করা দেশে নিয়ে যায়। বিন্ধ্যাচল থেকে হিমাচল। গোটা জায়গাটাকেই বলা হত আর্যাবর্ত। আর্যদের প্রবল প্রতাপ চতুর্দিকে। শুরু হয় জনপদের বিস্তার। পঞ্চজনপথ (কুরু, পাঞ্চাল, শূর সেন, চেদি ও মৎস্য) কে নিয়ে তৈরী হল ব্রহ্মর্ষিদেশ। অযোধ্যা এরই অন্তর্গত। আগে অযোধ্যা ছিল রাজধানী। অযোধ্যার আর এক নাম সাকেত।

বিহারের এক সামন্ত রাজা। নাম ছিল তার এস. সাহু। তিনি অযোধ্যাতে সরযূর তীরে সাড়ে পাঁচ বিঘে জমির উপর এই শ্রীরাম-জানকী মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এখানেই ছিল রাণীমহল, রাজমহল, অতিথিশালা আরও কত কিছু! এখন শুধু এক খণ্ডহর। এখনও বহু অযোধ্যাবাসী এটিকে সুরসার মন্দির বলেন।

এগুলো সব দিব্যমন্দির। আপাতদৃষ্টিতে এর একজন নির্মাণকর্তা থাকলেও গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় শ্রীভগবানই এর সৃষ্টিকর্তা। শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব তখন বারাণসীতে। কাশীর রামাশ্রমে। হঠাৎ একদিন বললেন, অযোধ্যাতে একটা জায়গা দেখ, তোদের একটা আশ্রম হবে। সামনেই ছিলেন কিঙ্কর সিদ্ধানন্দদাদা। বেরিয়ে পড়লেন। চলে এলেন অযোধ্যায়। উঠলেন বাণারসী পাণ্ডার কাছে। অতিবৃদ্ধ প্রাচীন সহায় সম্বলহীন। বললেন, সীতারামবাবার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন এই সুরসার মন্দির আপনাদেরই হবে। পাণ্ডাবাবার তৎপরতায় ফৈজাবাদ কোর্টে নীলামে চলে যাওয়া এই মন্দির পুনরায় নীলামে চড়ে। এবারে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি হন সিদ্ধানন্দদাদা। কিঙ্কর সহজানন্দ (ড. গোপাল মিত্র) প্রাথমিক টাকাটা দেন। পরে ঠাকুর কিঙ্কর রামেশানন্দের কাছ থেকে টাকা ধার করেন। বহু বিষয়ী লোক বিফল মনোরথ হয়ে চলে যান। শ্রীশ্রীঠাকুর কিঙ্কর রামেশানন্দ-জীকে লেখেন—''ধার নিচ্ছি। এ মাসের মধ্যে শোধ করে দেবো...।''

ভাবলেও অবাক হতে হয় কি শুদ্ধাসত্ত্ব আধার ছিলেন রামেশ্বরদা। রামেশ্বরদাদার কাছ থেকে ঠাকুর টাকা ধার নিচ্ছেন। সেই টাকায় আশ্রম হচ্ছে আবার বলছেন, 'এক মাসের মধ্যে শোধ করে দিব।'

কি ছিল সেদিনকার 'সুরসার' মন্দিরের অবস্থা? হতশ্রী অবস্থা। সুদৃশ্য মার্বেলগুলো চোরে খুলে নিয়ে গেছে। সব নেই। জল নেই, জানলা নেই, দরজা নেই, আলো তাও নেই। তাহলে আছেটা কি? একদল দখলদার। আর আছেন আভরণহীন, পোষাকহীন শ্রীবিগ্রহ। কতবার দেখেছি শ্যামসুন্দরের পোষাক মহামিলন মঠ থেকে নিয়ে যেতে। রামজীকে পরাতে হবে। ভিক্ষে করেছেন ভক্তদের কাছে। কাউকে বলেছেন বালব্ কিনে দাও, কাউকে বলেছেন মুকুট কিনে দাও, রাজার বেটাকে সাজাতে হবে যে। কিঙ্কর অতুলানন্দজীর ভাষায় 'এককথায় বিভীষিকাময় পরিস্থিতি, হাঁ করা কবন্ধের মত পড়ে আছে মন্দির আর তার বিগ্রহগুলো।' শ্রীরামজীর সেবার জন্যে মাধুকরী করছেন, অযোধ্যা থেকে কোলকাতা প্রায়ই ডেলি প্যাসেঞ্জারী করছেন আর ক্রমশঃ ইগোলেশ হচ্ছেন। যাঁর নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের জন্য বিবেচিত হচ্ছে, কোনো একটি রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নাম উঠেছে তিনি কিনা রামজীর জন্যে সেবা ভিক্ষা করছেন!

পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তখনকার দিনে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল পরম সুহৃৎ বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজী। মনে পড়ে বাগবাজারে ছোট ভাস্করদের বাড়ীতে আসতেন। ভাস্কর জননী ঊষাদেবী কিছু না কিছু সেবা

দিতেনই আর আমরা পেতাম অযোধ্যার রামজীর প্যাঁড়া প্রসাদ।

এক বীভৎস পরিবেশ। কেউ থাকতে চায় না। যে আসে সেই পালাতে চায়। ১৯৯৩ সালে ট্রাস্টী বোর্ড কিঙ্কর বিদ্যারত্নকে সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করলেন এই মন্দিরের সেবা পূজার ভার।

সেইসময় বিদ্যারত্নের মুখে একটা শ্লোক প্রায়ই শোনা যেত ''দদাত্যপি ন গৃহ্নতি ভক্তাঃ মৎসেবনং বিনা''। ভগবান বলছেন আমার ভক্ত মুক্তি দিলেও সে আমার সেবা ভিন্ন কিছুই চায় না। বলতেন, গুরুদেব যখন এই সেবার ভারটা দিয়েছেন, তখন ছাড়ি কেন? আর একটা কথা বলতেন, 'গৌ খাতা হ্যায়, হাম দেখতা হ্যায়'। কিঙ্কর বিদ্যারত্নজী ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন শরণাগত ভক্ত। তবে জীবনে যত রোজগার করেছেন সব এই 'খণ্ডহরের' পেছনে ঢেলেছেন। ভাইবোনেরা ওকে বাড়ীতে ফিরে আসতে বলেছেন, বলেছেন—দাদা তুমি চলে এস। বলতেন, Yes I am on command, no doubt. ফেরেন নি। অযোধ্যার শ্রীরাম-জানকী মন্দিরই হল স্থায়ী ঠিকানা। ড. নির্মল কুমার পাণিগ্রাহী ছিলেন বিদ্যাসাগরের জেলার লোক। অসম্ভব গুরুকৃপাও যেমন পেয়েছেন তেমনি লাভ করেছেন মাতৃকৃপা। মা চিত্তবাসিনী পাণিগ্রাহী ছিলেন খুব ভক্তিমতি। সম্ভবত নিগমানন্দ পরমহংস ঘরানায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। স্বামী সত্যানন্দের কাছে। বাবা জীবনকৃষ্ণ পাণিগ্রাহী ধর্মপরায়ণ, বিদ্বান, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তবে কারুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন কিনা জানতে পারিনি। চিত্তবাসিনীদেবী বিদ্যারত্নজীকে ডাকতেন 'কচি' বলে। সবসময় বলতেন, আমার কচির কষ্ট হবে আমি অযোধ্যা থেকে যাব না। ওকে দেখার কেউ নেই। জীবনকৃষ্ণ পাণিগ্রাহী যেমন সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন তেমনি ধনীও ছিলেন। চিত্তবাসিনীদেবী নিজের সমস্ত গয়না পুত্র-পুত্রবধূ-কন্যাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন শুধু একটা ভাগ আলাদা করে রাখলেন। বললেন এটা আমার কচির রামজীর জন্যে। রাজার বেটা রামজী তাঁর মাথায় সোনার মুকুট থাকবে না তাই কখনও হয়?

ছোটবোনকে বলেছিলেন, তুমি সবচেয়ে ছোট সীতামার মুকুটটী দাও।

ছোটবোন যখনই বলতেন, দাদা তুমি কেমন আছ? তুমি ওখান থেকে চলে এস, সব ফেলে দিয়ে চলে এস। তোমার জন্যে মাও তো আসতে পারছেন না, অন্য ভায়েরা সেবা করতে পারছে না—এটা তো মানবে?

তোমাদের কাছে ফিরে গিয়ে কি করবো? তোমরা তো 'খঙ্গাচণ্ডীতে' নিয়ে যাবে (কাঁথির শ্মশান), রামজীর কাছে নিয়ে যেতে পারবে কি? হাসতে হাসতে পাণিগ্রাহীদা বলতেন। বাড়ী থেকে আলাদা থাকলে কি হবে সকলের খবর কিন্তু রাখতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব ড. নির্মল কুমার পাণিগ্রাহীদাদার কাঁথির বাড়ীতে শ্রীচরণধূলা দিয়েছিলেন। শ্রীঠাকুর আসছেন শুনে বাড়ীর সমস্ত মায়েদের এমনকি ছোটছোট মেয়েদের পর্যন্ত সাদাসিধে করে লালপাড় শাড়ী পরান হয়েছিল। শ্রীঠাকুর পাণিগ্রাহীদার মাতৃদেবীর কাছ থেকে পাণিগ্রাহীদাকে চেয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'মা তুই রত্নগর্ভা তোর ছেলেকে আমায় দে।' পাণিগ্রাহীদার বাবা কিছু বলেন নি। মাতৃদেবী এককথায় রাজী হয়ে গেছিলেন।

কঠোর বর্ণাশ্রমী ছিলেন। নিজের আত্মীয়দের কাছেও যেতেন না। অন্নপ্রসাদ তো দূরের কথা। কখনও সখনও ডালিয়া নিয়েছেন, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আমি ঠাকুরকে জানাই, ঠাকুর যেটা বলবেন আমি তোমাকে জানিয়ে দেবো। ছোট বোন গীতাদি বললেন, আশ্চর্য্যের ব্যাপার কি জানেন, দাদা যা বলত সব মিলে গেছে। কিছু বললেই বলতেন, আমি বলবার মালিক নই। শেষেরদিকে অনেককেই বলেছেন, একবার অযোধ্যায় এস, একবার দেখা করে যাও।

পাণিগ্রাহীদার ছোটবোন গীতাদেবী আর কিঙ্কর আত্মানন্দদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র কিঙ্কর শ্রীজগন্নাথজী একসঙ্গে তখন স্কটিশচার্চ কলেজে পড়াশোনা করতেন। আর পাণিগ্রাহীদা করতেন অধ্যাপনা। যদিও গীতাদি ভাল করে জগন্নাথদাকে চিনতেন না। পরে পাণিগ্রাহীদা

বলেছিলেন। এদিকে হয়েছে কি সে সময় গুরুকরণের জন্য পাণিগ্রাহীদা ছটফট করছেন। কোথায় সদ্‌গুরু পাওয়া যায়? একে জিজ্ঞেস করছেন, ওকে জিজ্ঞেস করছেন। একদিন কলেজের সামনে একটা রিক্সাওয়ালার সাথে দেখা। সে অনর্গল 'রামচরিত মানস' মুখস্ত বলে চলেছেন। পাণিগ্রাহীদাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, সনত্ মানে কি? পাণিদা উত্তর দেবার আগেই তিনি বলতে শুরু করেন—স—সততা, ন—নম্রতা, ত—ত্যাগ।

বিস্ময়ের ঘোর যখন কাটল তখন আর রিক্সাওয়ালা সেখানে নেই। পরবর্তী জীবনে তিনি প্রায়ই বলতেন শ্রীশ্রীঠাকুরই হচ্ছেন একমাত্র সনত্। ঠাকুরের মধ্যে এই তিনটি গুণই পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল।

গুরু কোথায়, কে আমার গুরু হবে এই রকম যখন মাথা-ঘোরা অবস্থা চলছে সেই সময় কে একজন বলেন, ঐ তো আপনারই ছাত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আছেন, ওঁরই দাদু শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব। আপনি ওঁকে গুরুপদে বরণ করতে পারেন। বলে দেখুন না?

তারপর একদিন খুলে গেল গোমুখের দ্বার।

ঝিমুনি কেটে গেল। সব বাঁদরের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। একের পর এক দর্শনার্থী আসছেন। শবদেহে মাল্যদান করে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। খুব সুন্দর করে সাজান হল পাণিগ্রাহীদাকে। বাঁশের দোলায় দুলতে দুলতে এবার তিনি চলে যাবেন সরযূর তীরে। পঞ্চভূতে লীন হতে। সাজান হয়ে গেছে তবু যেন কি একটা নেই—মনে হচ্ছে। অথচ ধরতে পারছি না।

হঠাৎ দেখি লোহার দরজাটা ঠেলে ঢুকছেন তেতেরিয়া ঠাকুরবাড়ীর ছেলে শ্রীসুধীর মহারাজ। চটপট ব্যাগপত্তর রেখে পাণিগ্রাহীদার শবদেহটাকে সাজিয়ে দিলেন। তারপর কপালে এঁকে দিলেন রামানন্দীয় তিলক। প্রস্ফুটিত হল পাণিগ্রাহীদার আসল মুখ। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের আচার্য্য। শ্রীরামজীর একান্ত সেবক। ধ্বনি উঠল রামনাম সত্য হ্যায়। চিরকালের মত পাণিগ্রাহীদা শ্রীরাম-জানকী মন্দির ছেড়ে চললেন। পড়ে রইল বিশাল গ্রন্থ সংগ্রহ। পড়ে রইল ধন-দৌলত-সম্মান। আর রইল ব্যাগে সামান্য কিছু অর্থ। শেষেরদিকে বলতেন, আমি এখন কপর্দকশূন্য। কেউ বিশ্বাস করতো, কেউ করতো না। বলতেন—

যো মাং ভজতে নিত্যং ধনং তস্য হরাম্যহম্।
করোমি বন্ধুবিচ্ছেদং সোহতি কষ্টেন জীবতি॥
এষু কষ্টেসু সন্তপ্তঃ যদি মাং ন পরিত্যজেৎ।
দদামি পরমং লোকং দেবানামপি দুর্লভম্॥

বলতেন, ধন তো থাকবে না ভাই, সব হরণ হয়ে যাবে—বলেই হাসতেন।

অতুলানন্দজী জিজ্ঞেস করেছিলেন, সারাজীবনের কষ্টার্জিত সঞ্চয় শেষ করে নিঃস্ব হয়ে গেলেন—কোনো অনুতাপ, অনুশোচনা হয় কি? নিদেনপক্ষে ভবিষ্যতের চিন্তা?

বলেছিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব হয়। তবে অর্থের জন্য নয়, ঠাকুরের ভবিষ্যত কর্মসূচীর জন্যে, যেগুলো ইনি এর মধ্যে ভাসিয়েছেন বা ভাসাচ্ছেন।

আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। সরযূর তীরে আমরা সব এসে পৌঁছুলাম। একদল দাহ করে ফিরে যাচ্ছে আর একদল দাহ করাতে ঢুকছে। সরযূর জল বাড়ছে। একটু দূরে চিতা সাজান হল। নাম চলছে। কিঙ্কর দেবী নাম ধরে আছেন। কিঙ্কর অশোকানন্দজী কোথা থেকে একটা করতাল যোগাড় করে বাজাতে শুরু করলেন। শ্রীনাম সুন্দর এবার নৃত্য শুরু করলেন। কিন্তু আবার একটা হট্টগোল। কি ব্যাপার? আরে ইনি তো অপুত্রক। কে এর মুখাগ্নি করবেন? একের পর এক নামগুলো উঠছে আর সেগুলো কেটে যাচ্ছে। শেষকালে কোলকাতা থেকে নির্দেশ এল পরাপর গুরুবাড়ীর সন্তান সুধীর মহারাজই মুখাগ্নি করবেন। এর থেকে ভাল সিদ্ধান্ত আর হয় না। সকলেই ধন্য ধন্য করে উঠলেন। তেতেরিয়া বাড়ীর বংশীধরজীর প্রতিনিধি সুধীর মহারাজ পরম মমতায়, পরম আন্তরিকতায় শবদেহকে স্নান-অভিষেক করিয়ে মুখাগ্নি করলেন। এমনকি স্নান করাবার সময় কিছু মল নির্গত হয়েছিল সেটাকে পর্যন্ত পরিষ্কার করে পাণিগ্রাহীদাকে ঠেলে দিলেন—জয়যাত্রায়। হে ডিভাইন ট্রাভেলার, হে পথিক ক্রম উত্তরণ ঘটুক

আপনার দেবযান মার্গে। বিরজা নদী পেরিয়ে চলে যান ওঙ্কারলোকে। প্রচণ্ড বাতাসে চিতা জ্বলে উঠল দাউদাউ করে। কি প্রচণ্ড লু বইছিল একটু আগে। ভাবছিলাম কি করে দাঁড়িয়ে থাকবো শ্মশানে। ক্রমশঃ কেউ বুঝতে পারল না আকাশ থেকে নেমে এল এক বিরাট বড় মেঘের ছাতা। আমরা সবাই তার তলায় আশ্রয় নিলাম।

সন্ন্যাস নেবার খুবই আগ্রহ ছিল কিন্তু হয়ে ওঠেনি। তবু এই শুক্ল সন্ন্যাসী বলে গেলেন, ''মন প্রাণ দিয়ে লেগে যাও শ্রীগুরুদেবের কাজে। প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন পেয়ে যাবে। সব কৌতূহল, সব প্রশ্ন মিটে যাবে।'' উচ্চতম ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত করে মোক্ষযাত্রার যাত্রীরূপে পাণিগ্রাহীদা চললেন ওঙ্কারলোকে।

একটা জায়গায় সবাই জড়ো হয়ে আছেন। পাণিগ্রাহীদার নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার হল আলোচনার বিষয় বস্তুই জ্ঞানমার্গীয়। কিঙ্কর সামানন্দজী হাসতে হাসতে বললেন, জীব যে বিষয়ে সংস্কারগ্রস্ত মৃত্যুর পর তার সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা হবে। এটা আমাদের শাস্ত্রে আছে। এক একটা বিষয় থেকে ঠিক ব্রহ্মলোকের কথা, ব্রহ্মজ্ঞানের কথা উঠে আসছে। আর একটা কথাও উঠে এল—''যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ''—যে জানে না সেই জানে, যে জানে সে জানে না।

মঙ্গল। মেদিনীপুরেরই ছেলে। পাণিগ্রাহীদার ছায়াসঙ্গী। বহুদিন ধরে সেবকের কাজ করছেন। ওর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে পাণিগ্রাহীদা প্রশ্ন করেছিলেন, তুই কি হবি— বাঁদরের বাচ্ছা না বেড়ালের বাচ্ছা? বলেছিলেন, ভগবানকে ভালবাসতে হলে একদম পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে হবে। বাঁদরের বাচ্ছা বাঁদরকে জড়িয়ে ধরে কিন্তু বেড়ালের বাচ্ছাকে তার মা ধরে থাকে। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে থাকতে হবে। কলিতে ধর্ম একভাগ আর সব অধর্ম।

মঙ্গলকে বলতেন, শাস্ত্র-আচার-নিয়ম যিনি মানেন তিনিই এই ধরাতে রামচন্দ্র। পরম দয়ালু। রাম রাজা আনন্দের দুলাল। রাজার ব্যাটা। ওঁকে রাজার মত রাখবে। খুব যত্ন করবি। একবার যদি তিনি টাচ্ করেন তাহলেই তোমার হৃদয়ের দরজা খুলে যাবে। নিজে প্রসাদ পাবার সময় জিজ্ঞেস করতেন, আশ্রমের সকলে প্রসাদ পেয়েছে কিনা? বলতেন, 'প্রত্যেকে খেয়েছে তো—জিজ্ঞেস কর, মঙ্গল। মঙ্গলকে শেখাতেন, ঘুম থেকে ওঠার পর নিজের হাতের তালু দুটো দর্শন করে প্রণাম করবে, তারপর ডান পা'র বুড়ো আঙ্গুল ভূমিতে ঠেকিয়ে মন্ত্র পড়বে। শ্রীভগবান এই হাত দুটোতে অবস্থান করছেন। তোর এতটুকু কেউ মেরে দিতে পারবে না। ভগবানের আদর্শ মেনে চলবে। তিনিই করাচ্ছেন—এটাই ভাববে। বলতেন, 'ভালই তো ভাল বটে, মন্দকে ভাল ক'র।' তুমি যে তার শুভাকাঙ্ক্ষী সেটা প্রমাণ করতে হবে। কে করালেন—গোবিন্দ করালেন। আরও বলতেন, হর টাইম প্রসাদী খাবে। মহা প্রসাদের মহাগুণ। কলসীর জলের মধ্যে মহাপ্রসাদ ফেলে দিতেন। গুরু চরণামৃত রোজ পান করতেন। মাটিতে দুটো জিনিস হয়। এক টালি আর এক ইট। টালিতে কখনও ভিত হয় না। আর ইটে কখনও ছাউনি হয় না। আচার-নিষ্ঠা ঠিক করে রাখবে। সকলকে ভালবাসবে, আরও ভালবাসতেন যিনি নিষ্ঠা পালন করতেন। বলতেন, অসবর্ণ যদি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে ওঠে ভগবান সেখান থেকে পালায়।

-হ্যাঁরে মঙ্গল, ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম দিনের কথা পাণিদা কিছু বলেন নি?

-হ্যাঁ। কে একজন বলেছিল ঠাকুরের নাতি জগন্নাথ, ওকেই তো আপনি পড়ান। ওকে আপনি বলুন না। বলাতে জগন্নাথদা বলেছিলেন, জেনে আপনাকে বলবো। তারপর যেদিন ঠাকুরের কাছে গেলেন সেদিন ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, কে কে এসেছে? মুখোমুখি হতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশ্ন—বাবা, সন্ধ্যা কর?

-হ্যাঁ করি।

-এক সন্ধ্যা না ত্রি-সন্ধ্যা?

-ত্রি-সন্ধ্যা করি।

শুনেই ঠাকুর জড়িয়ে ধরে আদর করেন। চুমু খান।

আসলে উপনয়নের পর থেকেই সন্ধ্যা করা শুরু।

স্বামীজীর (কিঙ্কর বিদ্যানন্দকে অযোধ্যায় অনেকেই স্বামীজী বলেন, তাতে ওর গেরুয়া থাক বা না থাক) পিতামহই সন্ধ্যা করতে শেখান। বাড়ীটা বড় সাত্ত্বিক ছিল। ডিম, পেঁয়াজ, মাংস কখনই ঢোকেনি। যেদিন যেদিন দাদু থাকতেন না সেদিন বাড়ীতে পণ্ডিত এসে সন্ধ্যা করিয়ে যেতেন।

ওদিকে চিতা তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রবল বাতাস বইছে। যদি আগুন নিভে যায়? হঠাৎ দুম করে একটা শব্দ হল। সবাই পেছন ফিরে তাকায়। এর মধ্যে সুধীরদা একবার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, জগতে সবচেয়ে সুখী কে? রাম কা দাসই সবচেয়ে সুখী। আর দুখী— দরিদ্রতা হল সবচেয়ে বড় দুখ। পাণিগ্রাহীদা'র একটা অস্বাভাবিক সাহস যেমন ছিল তেমনি ছিল শ্রীগুরুদেবের প্রতি নির্ভরতা, না হলে এখানে উনি এত বছর থাকতে পারতেন না। আবার একটা শব্দ হল—পেস মেকারটা ফেটে গেল।

রোদ বাড়ছে। সরযূ এগিয়ে আসছে। চিতাটা ক্রমশঃ নামতে নামতে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড কেউ কোনরকম স্পর্শ পর্যন্ত করল না চিতাটিকে। দরকারই পড়ল না।

সরযূ থেকে অবগাহন স্নান সেরে উঠে আশ্রমের দিকে যাচ্ছি এমন সময় অশোকানন্দজী বললেন, কাল রাতে, ঠিক বুঝলাম না, স্বপ্ন দেখছিলাম না ঝিমুনির ঘোরে ছিলাম।

-কেন কি দেখলেন?

-'দেখলাম, একটা রথ এল। সেই রথের সামনে একটা বাচ্ছা ছেলে দাঁড়িয়ে। মুখটা অবিকল পাণিগ্রাহীদা'র মত। শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন রথে। হাসতে হাসতে ঠাকুর হাতটা বাড়ালেন। পাণিগ্রাহীদা লাফিয়ে উঠে পড়লেন রথে। দুজনে মিলে গেল। দেখতে একরকম হয়ে গেল।'

আজ একাদশী। সমস্ত আশ্রম ধোয়াধুয়ি হয়ে গেছে। বিগ্রহ উপবাসী রয়েছেন। তাদের ভোগ নিবেদন করা হবে। সন্ধ্যারতি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে একটি ছেলে এসে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে বসল। অপূর্ব কণ্ঠ। একের পর এক ভজন শোনাতে লাগল শ্রীরামজীকে। অশোকানন্দজী তন্ময় হয়ে ওর ভজন শুনছেন। একটু বাদেই 'চক্রপাণি' এসে বসল। চক্রপাণি বর্তমানে রামজীর পূজা করেন। গানবাজনাসহ ভাগবতের প্রবচন করেন। ছেলেটি ওর দলের। চক্রপাণির খুব সুন্দর চেহারা। নেপালী। আটটি ভাষা জানে। দুটি ভাষায় এম.এ.। সামানন্দজীর খুব পছন্দ একে। সামানন্দজীরা রওনা দিয়েছেন কোলকাতার দিকে। বিঠ্ঠলজী আদেশ করেছেন আমাদের দুজনকে মঠ ছেড়ে বেরুবে না।

-চক্রপাণিকে প্রশ্ন করলাম, হ্যাঁরে তোরা কিছু বুঝতে পেরেছিলিস্ কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার-স্যাপার?

-কি বুঝবো? ভোর সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে ওঠা। স্নান সেরে মঙ্গল আরতি করে পাঠ-প্রার্থনায় বসে পড়া। নিত্য একই নিয়ম। উনিও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রণাম নিবেদন করে তবে জপে বসতেন।

আগেরদিন কে একজন অনেক তুলসী দিয়ে গেছেন। এখানে তো তুলসী পাওয়া যায় না। সেই তুলসী দেখে কি আনন্দ! দুহাত ভরে তুলসী দিচ্ছেন আর বলছেন এই নাও! এই নাও! রামজীর কাছে এসে হাসছেন আর কি যেন বলছেন। শেষে চাবির গোছাটা নিয়ে আমার (চক্রপাণি) হাতে দিয়ে বললেন, আজ থেকে রামজী তোমার জিম্মাদারীতে রইল। তারপর শ্রীগুরুদেব, পরমগুরুদেব এবং শঙ্করদাকে প্রণাম করে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

দুপুরবেলায় যখন উনি বাথরুমে পড়ে গেলেন তখন তুমি কোথায় ছিলে?

-আমি তো শুয়েছিলাম। অখিলেশের গলার আওয়াজ পেয়ে হট্টগোলের শব্দ শুনে দৌড়ে বাইরে আসি। এসে দেখি বাইরে অটো এসে গেছে। তারপরই হাসপাতালে দৌড়ুই। প্রথমে তো ডাক্তার ফিরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাও। শেষে ধরাকরা করে ভর্তি করা হয়। আই.সি.ইউ.-তে ঢুকিয়ে ডাক্তাররা চেষ্টা করতে থাকেন। পুরো জ্ঞান ছিল। মারা যাবার আগের মুহূর্তেও বলছেন—

আমি তোমারি আমি তোমারি আমি তোমারি
প্রিয় হে আমি তোমারি
তুমি আমারি তুমি আমারি তুমি আমারি
নাথ হে তুমি আমারি।

'নাথ হে তুমি আমারি'—এটা এত জোরে বলে উঠলেন যে কি বলব! আর আমার হাতটা জোরে চেপে ধরেছিলেন। ঐটাই 'নাথ হে' শেষবারের মত উচ্চারিত হল।

খুব ফাঁকা লাগছে। সব্বাই খুব পরিশ্রান্ত। একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সরযূর দিক থেকেই হয়তো আসছে। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু ভাবছি আমার সাথে শেষ দেখা (২০১৪) মহামিলন মঠে। প্রণাম নিবেদন করে বললাম, আপনি যে ক্রিয়াযোগটা দেবেন বলেছিলেন?

-হ্যাঁ, এখানে তো হবে না, তুমি অযোধ্যায় চলে এস।

এরপরই আমার একটা ব্যক্তিগত দুঃখের কথা নিবেদন করেছিলাম। উনি কি এক অদ্ভুত শান্তভাবে বললেন, 'দেখ আমাদের উনি (ঠাকুর) ছাড়া আর কেউ নেই, তুমি সব ওনাকেই জানাও।' মনটা শান্ত হয়ে গেছিল। মেঝের উপর একটা কম্বল বিছানো। সামনে কোশাকুশি। শান্ত মূর্তি। কামনা বাসনা মুক্ত এক পুরুষ। প্রসন্ন আত্মা। একে কোনো দুঃখই স্পর্শ করতে পারবে না। এখন হয়তো ব্রাহ্মীস্থিতিতেই অবস্থান করছেন। কামনার কোনো বেগই এঁকে বিচলিত করতে পারে না। কিঙ্কর বিদ্যানন্দ একজন যোগী। চেতনার বিশাল সমুদ্র। নিথর, নিশ্চল। একটা শ্লোক ওর সম্পর্কে ব্যবহার করতে ইচ্ছে করছে। জানিনা সু-প্রযুক্ত হল কিনা?

আপূর্য্যমান চল প্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদবৎ
তদবৎ কামা যঃ প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।

স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে নানারকম শব্দ বিষয় এসে প্রবেশ করে, কিন্তু তিনি কখনও ক্ষুভিত হন না। বরং শান্তি লাভ করেন। আমরা যারা সাধারণ, তারা কেবল আমার আমার করি কিন্তু প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা সর্বত্র যে আত্মা আছেন তার সাথে একত্র থাকেন। আমি বা আমার ভাব নেই। প্রণাম।

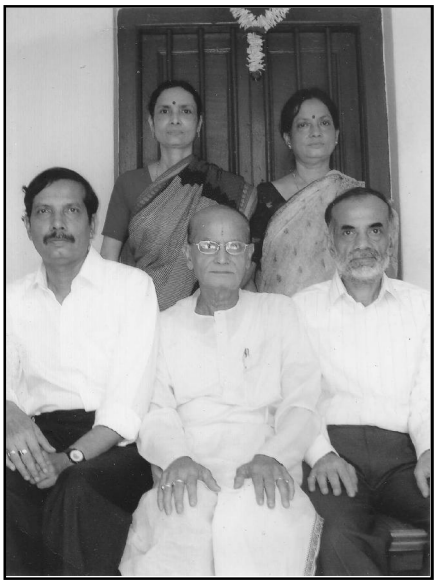

মাঝে- নির্মল কুমার পাণিগ্রাহী, বাঁয়ে- বিমল কুমার পাণিগ্রাহী (মেজ), ডাইনে- কমল কুমার পাণিগ্রাহী (ছোট),
পেছনে ডানদিকে ছোট বোন অঞ্জলি মহাপাত্র, বামদিকে বড় বোন গীতা দাশ (শর্মা)

‘তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে’

অযোধ্যায় আচার্য্যবরের অন্ত্যাবসান ঃ স্মরণাঞ্জলি

কিঙ্কর সেবারাম দুর্গানন্দ

আগেই প্রস্থান করেছেন সীতারামলোকে বন্ধুবর ও অগ্রজপ্রতিম জ্যোতিষাচার্য্য সুকেশ জ্যোতিঃশাস্ত্রী (আমহার্স্ট স্ট্রীট), পণ্ডিতবর বিজ্ঞান ও পুরাণের নব ব্যাখ্যাকার বিপ্লবী কিঙ্কর রাজারামজী (অসিতি মুখোপাধ্যায়, ৯৭ বছর), প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক নামপ্রেমী গোল্ড মেডালিস্ট ডা. বি. কে. গাঙ্গুলী (ইনি শ্রীসীতারামের ও তাঁর সন্তানদের চিকিৎসাও করেছেন), সীতারামের উচ্চৈঃশ্রবা শ্রীসীতারামের অন্তরঙ্গ শ্রীঅঙ্গসেবক কিঙ্কর যদুপতি দত্ত, পরে ১২ই জুন মন্ত্রশিষ্য কৃপাধন্য সাহিত্যিক প্রবর শক্তিপদ রাজগুরু (চিত্রনাট্যকার ও লেখক- ‘মেঘে ঢাকা তারা, অমানুষ, বাঘিনী) ইত্যাদি। এঁদের সবাইকেই যথাযোগ্য বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম।

ঐতিহ্য ও দর্শন সমন্বয়ে গঠিত জীবন, কর্ম, জ্ঞান ও শ্রীগুরুসেবার সমাহারে বিদগ্ধ বৈরাগ্যপ্রাপ্ত মহাজীবন ড. শ্রী নির্মল কুমার পাণিগ্রাহীর (কিঙ্কর বিদ্যানন্দজী)। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর কিঙ্কর বিদ্যানন্দজী সম্প্রতি ৭ই জুন, ২০১৪ সকাল ৮-১১ মিঃ আমাদের সকলকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করে সীতারামলোকে প্রস্থান করলেন। হচ্ছে যুগাবসান।

পিতা শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাণিগ্রাহী (কাঁথি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ), মাতা চিত্তবাসিনীদেবী। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামের পাদপীঠ ও বিশিষ্ট বিপ্লবীদের জন্ম ও কর্মভূমি বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর বীরের জন্মভূমি মেদিনীপুরে জন্ম। দর্শনে এম.এ., পি.আর.এস (প্রেমচাঁদ, রায়চাঁদ স্কলার), পি.এইচ.ডি.ডি.লিট, এল.এল.বি. (১ম বিভাগে প্রথম)। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি লণ্ডনের ফেলো FRAS ও রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি আমেরিকারও ফেলো ইত্যাদি। বিদ্যার এই জ্ঞানগরিমার জন্যই সীতারাম নামকরণ করেন ‘কিঙ্কর বিদ্যানন্দ’। ড. শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ডি.লিট, মহামহোপাধ্যায়ের ছাত্র, বিদ্যায়, জ্ঞানে, জপধ্যানে, নিত্য হোমপূজায়, কণ্ঠে শালগ্রামধারী গৌরবর্ণ ধুতিপাঞ্জাবী পরিহিত আচার্য্যকে দেখে সবার মনে এক শ্রদ্ধা বিনম্র ভাব উপস্থিত হত।

পাণিগ্রাহীদা গম্ভীর। কিন্তু তিনিই উদ্বেলিত দয়ার সাগর বীর্যে সুগম্ভীর। বিদ্যাসাগর মশাই এর বিদ্যার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বলেই তো সীতারাম তাঁকে বিদ্যানন্দ নামে ভূষিত করেছেন, যা সার্থক হয়েছে, এরপরে সংস্কৃত শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে তর্কসাংখ্য বেদান্ততীর্থ!

আনুমানিক ১৯৭২ খ্রীঃ সীতারামের কাছে দীক্ষালাভ। অত্যন্ত কঠোর জপনিষ্ঠ, নিয়মাচারমান্য নিয়ম শৃঙ্খলাপ্রাপ্ত এই বিদ্বৎজন পাঠপ্রার্থনা ইত্যাদি মেনে চলতেন। মহামিলন মঠের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তাঁকে মঠের প্রেসের ছাদে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের পাশে থাকতে দেখেছি, তিনি সব নিয়ম পালন করেছেন।

এছাড়া তখন অসুস্থ ছাত্র সামানন্দজীকে পথ্যাদি দান ও সেবা করেছেন ঁকিঙ্কর ভূমানন্দদেবের (অধ্যাপক সদানন্দজীর) অনুরোধে। সীতারাম বলেছিলেন ‘মহামিলন মঠের পরিবেশ বিদ্যানন্দের পাণিগ্রাহীর অনুকূল নয়।’ ওর স্থান হবে শঙ্করাচার্য্যের তুল্য স্থানে। যাইহোক মহামিলন মঠ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বলরাম ধর্মসোপানে থাকতেন। ওখান হতেই ‘যতিধর্ম সমুচ্চয়ের’ বঙ্গানুবাদ করেন।

‘পথের আলো’য় তাঁর বিখ্যাত লেখা ওঙ্কারনাথ দর্শন। এছাড়া করেন সীতারামের ‘ব্রহ্মানুসন্ধানের’ ইংরাজী অনুবাদ যা দিল্লীর হেমন্তহংসজীর কাছে রক্ষিত আছে। ১৯৯৩ খ্রীঃ অযোধ্যাতে ‘শ্রীরামজানকী মন্দির’ যা ছিল বিহারের সুরসার রাজার বাড়ী---তাকে আইন জটিলতামুক্ত করে এবং মন্দির সংস্কারকরে নব আশ্রম ও ধর্মপীঠে রূপান্তরিত করেন। এই আশ্রমের সঙ্গে

সংযুক্ত বেদবিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় করে উত্তর প্রদেশ সরকারের স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করেন। যা ওখানকার হিন্দী কাগজগুলিতে প্রকাশিত হয়ে তাঁর কর্মদক্ষতা, গুরুসেবা, নিষ্ঠা ও বুদ্ধির প্রশংসা রাখে।

কোন প্রশংসাই প্রশংসা নয়, তিনি ছিলেন সম্প্রদায়ের রত্ন। বেদনার শেল বক্ষে নিয়ে তিনি এর হাওড়ার বাড়ীতে ছুটে গিয়েছিলেন—অনুভব করেছিলেন তাঁর হৃদয়বত্তা, প্রেম ও বেদনাকে। পরে পরবর্তীকালে শেষজীবনে অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের আচার্য্যপদে তাঁকে বরণ করা হয় অনুরোধ করে—তবে মহামিলন মঠের নানা জটিল কর্মযজ্ঞের বদলে জপধ্যান ও সেবা নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। তিনি অবশ্য সেই অর্থে গুরু হন নি। তবে সম্প্রদায়ের ও সেবার স্বার্থে, মালা তিলক মন্ত্রাদি দিয়ে সেবায় নিযুক্ত করতেন।

পেশায় অধ্যাপক স্কটিশ চর্চা কলেজের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের আংশিক অধ্যাপক হিসাবে অবসর নেন ২০০০ খ্রীঃ। তখন হতেই পূর্ণোদ্যমে সেবা চলতে থাকে অযোধ্যায় রামজানকী মন্দিরের। পিতৃমাতৃ সেবক বিদ্যানন্দজীর মাতার দেহত্যাগ হয় অযোধ্যায়। বর্ষীয়ান মা হিটারে সামান্য গরম পানীয় চাপিয়েছেন—ছেলে নির্মলকে একটু দেবেন—এই অসামান্য চিত্রকল্প ধরা আছে অযোধ্যার আশ্রমের দৃশ্যপটে। দুই বোন ভাই ভাগ্নেরা কলকাতায় আশ্রম করে দিতে চাইলেও পাণিগ্রাহীদা অযোধ্যায় আশ্রমবাসী হয়ে গুরুর সেবা করে অযোধ্যায় দেহত্যাগ করতে চাইতেন। পাণিগ্রাহীদার শ্রীমুখ হতে তথ্যপ্রাপ্ত তথ্য নির্ভর জীবনী লিখেছেন কিঙ্কর শরণানন্দজী—তা খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে—বিষাদের মধ্যেও এটি আনন্দ সংবাদ। অকৃত্রিম স্নেহ ও আশীর্বাদ তাঁর থেকে প্রাপ্ত হয়েছি তপ্ত অশ্রু দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম দেব। তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।

বিদ্যানন্দ-র কথার অর্থ ঃ

বিদ্যা—সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। এটি পরাবিদ্যা জগতাতীত বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানই পরাবিদ্যা।

জাগতিক বিদ্যা হচ্ছে জাগতিক বস্তু ও জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান বা জড়বিদ্যা। জড়বিদ্যা-জাগতিক জ্ঞান বা উচ্চতর ডিগ্রিলাভ ও জগতাতীত বিষয়ের জ্ঞান—আমি দেহ নই আত্মা-পরাবিদ্যা দুয়েতেই যিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন তিনিই বিদ্যানন্দ। পাণিগ্রাহীদার দুটিই লাভ হয়েছিল। বলাইবাহুল্য কিছু আশীর্বাদ পেলে তিনি বলতেন একে 'ঠাকুরকে জানাও।'

কিঙ্কর বিদ্যানন্দজীর আত্মত্যাগ, গুরুনিষ্ঠা, ধর্মনিষ্ঠা, জপধ্যান সমন্বিত জীবন তদ্‌গত প্রেমের পূণ্য কিরণ আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয় জোগাবে। শ্রীসীতারাম চরণে তাঁর চিরশান্তিলাভ ও বৈকুণ্ঠে তাঁর নিত্য পরিকরত্ব (যা তাঁর প্রাপ্য ও নির্দিষ্ট) প্রার্থনা করি।

পবিত্র সরযূ নদীর তীরে শ্রীরামজন্মস্থানে শ্রীমাতৃ সঙ্কাশে তাঁর পবিত্র শুক্ল সন্ন্যাসীসম দেহের অন্ত্যবসান—এক বেদনাবিধুর সুরবাণী ধ্বনিত করে—'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' 'আসিব যাইব চরণ সেবিব'। হরিগুরু তৎসৎ। স্বয়ং শ্রীভগবান যাঁর সৎগুরু সেখানে মরণে ভয় কি? বৈকুণ্ঠে করামলকবৎ।

আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই, হে দেব ক্ষমা করুন নিজগুণে---যদি আপনার মত গুরুভক্ত সেবককে কোনভাবে আমরা আঘাত দিয়ে থাকি। আর নিত্য আশীর্বাদ করুন, যেন শ্রীগুরুচরণে সতত যেন মন থাকে আমাদের। মুখে নাম, হাতে শুদ্ধ কাম—শ্রীগুরুসেবা। বিদ্যার সাগর হয়েও আপনি চেয়েছেন গুরুসেবা, আশ্রমসেবা করতে করতেই যেন দেহ চলে যায়।

আজ হতে শতবর্ষ পরেও অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের ইতিহাসে অযোধ্যার রামজানকী আশ্রমের রূপকার হিসাবে, সম্প্রদায়ের আচার্য্য হিসাবে আপনার পবিত্র নাম স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করবে।

আবার আসিবেন ফিরে আমাদের মাঝে নব রূপ ধরে। বৈকুণ্ঠে ঠাকুরঘরে সাজ পাল্টে আসবেন না?

'বিদ্যানন্দং শান্তসুশীলং গৌরাঙ্গ জপধ্যানহোমাসকক্তং।
রামজানকীমঠাধ্যক্ষ আচার্য্যং প্রণম্যহম্।।
সীতারাম প্রিয়ং সদা জ্ঞানান্বেষণ তৎপরম্।
ত্বং বন্দে অখিলজন শ্রদ্ধা সুপূজিত বিগ্রহম॥

সংঘ সমাচার

বিঠুরেশ্বরী সীতা ঃ সীতাময়ী বিঠুর

পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী

ঐশ্বর্যমণ্ডিত পূর্ণ ভারতবর্ষ। বহুজন্মের সাধনার ফল। দেবতাত্মা-হিমালয় কিরীট হয়ে তার শোভাবর্ধন করে। আর সেখান হতে নেমে আসা পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর করুণায় ধুয়ে যায় সমস্ত ক্লেদ। সুরেশ্বরী গঙ্গা, ত্রিভুনতারিনী গঙ্গা—মহারাজ ভগীরথের জন্মান্তরের তপস্যায় সিদ্ধিরূপিনী গঙ্গা। যার তীরে গড়ে উঠেছে বহু তীর্থক্ষেত্র। এমনই একটি স্থান হল বিঠুর। বাল্মিকী তপোবন।

শাস্ত্রজ্ঞরা বলে থাকেন—গঙ্গার বামতট হল কাশীতুল্য। প্রচার, জাঁকজমক বা জনসংখ্যা—কোনও দিক থেকেই কাশীর সমতুল্য নয় বিঠুর। তবে? আসলে বিঠুরের গরিমা অন্য জায়গায়। অন্য এক দৃষ্টিকোন থেকে বিঠুর মহীয়সী।

বহু বহু বছর আগে ত্রেতা যুগে কোনও এক বিষন্ন সন্ধ্যায় একটি ঘোড়ায় টানা রথ এসে দাঁড়িয়েছিল এখানে। সে রথের ধ্বজায় আঁকা ছিল সূর্য। অযোধ্যার রাজবংশের প্রতীক। রঘুকুলসূর্য শ্রীরাম তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছেন। আর এই কঠোর দায়িত্ব পালনের ভার দিয়েছেন তাঁরই প্রিয় অনুজ লক্ষ্মণকে। অদূরেই ঋষি বাল্মিকীর আশ্রম। তিনি এগিয়ে এলেন পতিপরিত্যক্তা অসহায়া সীতাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

এসো সন্তানের দুঃখনাশিনী, গতিমুক্তি প্রদায়িনী, আমার সকল সাধনার সিদ্ধিরূপিণী চিন্ময়ী মা। মা আমার তুমি এসো...

অতঃপর জনকনন্দিনী সসম্মানে অধিষ্ঠিতা হলেন মহর্ষির আশ্রমে। কালক্রমে দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন তিনি। অযোধ্যার রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী—কুশ ও লব। বাল্মিকীর রামায়ণ রচনা তখন সমাপ্তির পথে। মায়ের স্নেহে ও মহর্ষির তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল লব কুশ। বাল্মিকী তাদের শেখালেন রামায়ণ গান। বীণার তারে ঝংকৃত হত দুই ভাইয়ের মধুর কণ্ঠস্বর—

গাও বীণা গাওরে।
আমার সাধের বীণা রাম-গুণ গাওরে।
গাওরে শ্রীরাম কথা গাওরে জানকী ব্যথা
গাওরে ভরত গাথা গাওরে।

সারা তপোবন মুগ্ধ হয়ে শুনতো এই সঙ্গীত। আর নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন করতেন মা জানকী।

এদিকে শ্রীরাম অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। মহর্ষি বাল্মিকী এলেন অযোধ্যায়। সাথেই দুই প্রিয় শিষ্য কুশ ও লব। রাজদরবারে তারা শোনালেন রামায়ণ গান। স্তম্ভিত, নির্বাক হয়ে গেলেন সকলে। দেবশিশুর মতো সুকুমার এই বালক দুটি কে? মহর্ষি অবশ্য তাদের নিজের শিষ্য বলেই পরিচয় দিলেন। প্রকৃত সত্য জানাবার সময় এখনো আসেনি।

মহারাজের সূচনা হয়ে গেল। একটি সুলক্ষণযুক্ত অশ্বের ললাটে টিকা পরিয়ে দিলেন রঘুবীর। অশ্ব ছুটবে নিজের খুশিমতো। পেছনে থাকবে অযোধ্যার চতুরঙ্গ সেনা। কেউ অশ্বের গতিরোধ করলে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ অবশ্য হল না। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধের ঘোড়া আটকাবার সাহস কারুর হল না। নির্বিঘ্নেই সারা আর্যাবর্ত ঘুরে অশ্ব এসে ঢুকল মহর্ষি বাল্মিকীর তপোবনে। আর এখানেই প্রথমবার বাধা পেল অযোধ্যার সেনা। অশ্বের রজ্জু ধরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি বালক। বালক দেখে বিস্মিত হলেন সেনাপতি। অনুরোধ করলেন অশ্ব ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু সংকল্পে অটল দুই ভাই। অগত্যা যুদ্ধ। মুহূর্তের মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল অযোধ্যার সেনা। মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন সেনাপতি।

দূত অযোধ্যায় গিয়ে জানালো এ বিষয় সংবাদ। অশ্ব উদ্ধারে একে একে এলেন মহাবীর হনুমান, শত্রুঘ্ন, ভরত ও মহাবীর লক্ষ্মণ। কিন্তু লব কুশের বিক্রমের সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না কেউই। অগত্যা এলেন শ্রীরাম স্বয়ং। এবং খুবই বিস্মিত হলেন। এরাই তো সেই বালক দুটি, যারা কদিন আগেই রামায়ণ গান শুনিয়ে এসেছে তাঁকে। কিন্তু আজ আর সেই সুকুমার মুখদুটিতে মৃদু হাসি নেই, আছে প্রতিজ্ঞার ঝলক। বীণার বদলে হাতে ধনুঃ শর।

শ্রীরাম চেষ্টা করলেন বোঝাবার। এমন সুকুমার দেহে কে বা অস্ত্রাঘাত করতে চায়। অনেক অনুরোধের পর লবকুশ রাজি হল অশ্ব ফিরিয়ে দিতে। তবে শর্ত সাক্ষেপে। অশ্ব ফিরে পেতে হলে শ্রীরামকে এনে দিতে হবে দ্বাদশটি সৌরভযুক্ত স্বর্ণকমল। রঘুনাথ তখন সুমন্ত্রকে পাঠালেন অযোধ্যায়। কিন্তু তিনি খালি হাতেই ফিরে এলেন। মাতা কৌশল্যা জানিয়েছেন--- অযোধ্যালক্ষ্মী মা সীতা চলে যাবার পর থেকে রাজকোষে আর একটিও স্বর্ণকমল নেই। তখন লবকুশ এলো তাদের মায়ের কাছে।

-মা, মা, আমাদের সৌরভযুক্ত স্বর্ণকমল চাই...

-সে আমি কোথায় পাবো বাবা?

-আমরা কিছু জানি না—আমাদের চাই...

অগত্যা মা বললেন তবে চোখ বন্ধ করো। মায়ের আদেশ পালন করল লবকুশ। মা জানকী উঠে দাঁড়ালেন। একপা একপা করে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে স্বর্ণকমল ফুটে উঠল। সুরভিত স্বর্ণকমল। পরমানন্দে সেগুলি তুলে নিল লবকুশ।

মা সাবধান করে দিলেন, যিনি রথে বসে আছেন, তাঁর হাতে এগুলি দেবে না। সারথির হাতে দেবে।

-'এই দেখুন মহারাজ, সৌরভযুক্ত স্বর্ণকমল।' সুমন্ত্র চিৎকার করে উঠলেন। শ্রীরাম বিস্ময়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে। এমন সময় ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলেন মহর্ষি বাল্মিকী। সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করে বালকদুটির পিতৃ পরিচয় জানিয়ে দিলেন তিনি। শ্রীরাম বুকে জড়িয়ে ধরলেন দুই বীরপুত্রকে। সসম্মানে স্ত্রী ও পুত্রদের নিয়ে এলেন অযোধ্যায়। এরপর পূর্ণ দরবারে সীতাকে পুনরায় অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলা হয়। তিনি পুনরায় তাঁর পবিত্রতার প্রমাণ দেন। মাতা ধরিত্রী আকস্মিকভাবে বিস্ফারিত হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর কোলে আশ্রয় নেন।

যুগ যুগ ধরে বাল্মিকী তপোবনের সেই প্রাচীন ধারা আজও চলে আসছে। সৌজন্যে যুগাবতার আমাদের গুরুদেব ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব। তিনিই এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটির মাহাত্ম্য নিরুপণ করে একে তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা দেন। প্রতিষ্ঠা করেন লবকুশ আশ্রম। শ্রী অমল নিয়োগী এই আশ্রমের প্রাণপুরুষ। আর আশ্রম তপোবনের শোভাবর্ধন করছে শ্রীশ্রীঠাকুরের বৈদিক গুরুকুল।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও সীতানবমী উপলক্ষ্যে আমরা এসেছি এখানে। ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য কিঙ্কর সহজানন্দ (অধ্যাপক গোপাল মিত্র)। তাঁর সাথেই এসেছি আমরা। শ্রী তপন বোস, আচার্য্য সুধীর মহারাজ, কিঙ্কর সমীরণ, কিঙ্কর ভাস্কর, কিঙ্কর জনার্দন, অচিন্ত্যদা, গৌতমদা, কালীদা এবং গুরুকুলের ছাত্ররা। এছাড়াও বহু ভক্তশিষ্য ও মায়েরা এসেছেন।

আশ্রমের পাশ দিয়েই প্রবাহিত গঙ্গা। ভোরে স্নান সেরে এসে দেখি নগর কীর্তনে যাবার আয়োজন প্রস্তুত। মিছিল করে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সকলেরই হাতে ওঁ লেখা পতাকা। ঠাকুর, মা আনন্দময়ী, পরমগুরুদেব শ্রীরাম, মা জানকী ও মহাবীর হনুমানের ছবি বুকে নিয়ে আগে আগে চললেন আচার্য্য সুধীর মহারাজ, অধ্যাপক মিত্র ও তপন বোস, পেছনে পেছনে আমরা। তারকব্রহ্ম নামের সুরে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চললাম আমরা। সকলের মুখেই তখন একই সুর, সবাই এই তারকব্রহ্মনাম উচ্চারণ করছেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

ঠাকুর তো বলছেনই—

নামেই সব হয় মোক্ষ লাভ হয়।

তোদের এই হরিনাম জগতের একটি পরিবর্তন এনে দেবে।

সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করবে।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

কলিযুগে মুক্তির একমাত্র পথ হল নাম সংকীর্তন। পরিক্রমা পথে সমস্ত মন্দির ও আশ্রম- গুলিতে দক্ষিণা দেওয়া হল। আশ্রমে ফিরে হল রুদ্রাভিষেক ও যজ্ঞ। পূজাদি শেষে হল সাধু ভাণ্ডারা ও নরনারায়ণ সেবা। সব শেষ হতে বিকেল গড়িয়ে গেল।

আলো কমে আসছে। নির্জন গঙ্গাতটে বসে সূর্যাস্ত দেখছি। একটা সুন্দর অথচ বিষন্ন পরিবেশ। মনে জেগে উঠছে হাজার প্রশ্ন। বিঠুরের ইতিহাস কি তবে শুধুই বেদনার? বিরহীনি সীতার অশ্রুজলে ভেজা?

রাবণের সেনাপতি অকম্পন সীতা সম্পর্কে বলেছিলেন—

নৈব দেবী ন গন্ধর্বী নাপ্সরা ন চ পন্নগী।

তুল্যা সীমন্তিনী তস্যা মানুষী তু কুতো ভবেৎ।।

অর্থাৎ মানুষ তো দূরের কথা, দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা কিংবা নাগকুলের কোনও রমণীও তাঁর তুলনীয়া নন। যে হরধনু ভঙ্গ করে রামসীতাকে লাভ করেছিলেন, যে হরধনু বড়বড় রাজারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও নাড়াতে পারেননি, সেই হরধনু মা সীতা রোজ বামহাতে তুলে মন্দির মার্জনা করতেন। এমনই অসামান্য ছিলেন তিনি। কিন্তু তবু কেন তাঁর শেষ পরিণতি এত বেদনাময়? সারা রামায়ণ জুড়েই তো করুণ রসের আধিক্য। লবকুশের রাজ্যাভিষেকেও সে বিষাদের রেশ কাটে না।

ভাবতে ভাবতে সহসা উত্তরটা পেয়ে গেলাম। নির্বোধের মতো জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছি আমি। তাই শুধু বিরহ আর করুণ রসই ধরা পড়েছে চোখে। আধ্যাত্মিকতায় এসে মিয়ে যায় সমস্ত ভাবধারা, আর ভক্তিরসে মিশে একাকার হয়ে যায় বাকি সব রস। পার্থিব দৃষ্টি দিয়ে তাই এই তত্ত্বের বিচার অসম্ভব। কবি বলছেন—

‘কার মিলন চাও বিরহী
তাহারে কোথা খুঁজিছো
ভব অরণ্যে কুটিল জটিল গহনে
শান্তি সুখহীন ওরে মন।’

ফেরার সময় হয়ে এসেছে আমাদের। মনটাও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। প্রাণভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম মাকে।

জয় মা লবকুশ জননী। আবার যেন আসতে পারি তোমার চরণে। আমার জন্ম সার্থক হল আজ। ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ আজ উপলব্ধি করলাম। ঠাকুর আমার বহুকাল আগে বলে গেছেন ভারতবর্ষের স্বরূপ—

‘সেই জ্ঞানবিজ্ঞানের লীলাভূমি, সেই ত্যাগের মহাক্ষেত্র, সেই সমস্ত জাতির আদর্শ আর্যজাতির নন্দন কানন, সেই যোগী, জ্ঞানী, কর্মী বিশ্বামিত্র, বাল্মিকী, বশিষ্ঠ, ব্যাস ও শুকদেবের পুণ্য তপোবন হল এই ভারতবর্ষ। এখানেই ভগবান রাম, শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বলরাম, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন অবতরিত হয়েছিলেন। সেই সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী, অনুসূয়া ও লোপামুদ্রার তপস্যাক্ষেত্র হল এই ভারতবর্ষ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেবতারা বলছেন—

‘অন্যস্থানে বৃথা জন্ম নিষ্ফলং চ গতরগতম্।
ভারতে চ ক্ষণং জন্ম সার্থকং শুভকর্মদম্।।

এই সে আমার পুণ্য ভারতবর্ষ যেখানে যুগে যুগে শ্রীবিষ্ণু অবতার নিয়ে আসেন।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

‘ভক্তগণের সাধন মন্দির, সেই অধ্যাত্ম রাজ্যের মুকুটমণি বর্ণাশ্রম যার দেহ, ধর্ম যার ইন্দ্রিয়, ব্রহ্মবিদ্যা যার আত্মা।’ এই সে ভারতবর্ষ। এই অধ্যাত্ম জগতের উন্মেষের দ্বারাই ভারত এবং সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ হবে। এই আমার গুরুদেবের ইচ্ছা।

শ্রীগঙ্গাশ্রমে (চন্দননগর) প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব

গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল। আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব চন্দননগর রাণীঘাটে এই গঙ্গাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন ছিল বাঁশের কাঠামো। ক্রমে সেই গঙ্গাশ্রম আজকের রূপ গ্রহণ করেছে। বোঝাই যায় শ্রীশ্রীঠাকুর এখন সূক্ষ্মে বহু লীলা করছেন। সমস্ত আশ্রম, মঠ, মন্দিরের সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন। খুবই তৎপরতার সঙ্গে সে সমস্ত কাজ হয়ে চলেছে। কিছুদিন আগেও চন্দননগরের আশ্রমের ভগ্নদশা সকলকে পীড়িত করছিল। কিন্তু শ্রীগুরুসেবক চিন্ময়দা'র উদ্যোগ এবং তৎপরতায় আশ্রমের নব কলেবর হয়। দারুণ সুন্দর দেখতে হয়েছে। সুশীল সামন্ত'র কথা মনে পড়ছে। একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন।

এইরকম একটা মুহূর্তকে আস্বাদন করতে ওরা বেছে নিলেন ওদের প্রতিষ্ঠা দিবসকে। গত ৩১শে বৈশাখ ১৪২১ বৃহস্পতিবার বিপুল সমারোহে উৎসব পালিত হয়। যজ্ঞ, চণ্ডীপাঠ ছিল মূল আকর্ষণের কেন্দ্র। দিগ্‌সুই-এর অরূপ ছিল যজ্ঞস্থলীতে। চন্দননগর গঙ্গাশ্রমের উৎসবের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে উৎসব হলে কিছু না কিছু প্রাচীন গুরুভাই-গুরুবোনের দর্শন পাওয়া যাবেই। ফলে আপনা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা স্বত উৎসারিত হয়ে বেরিয়ে আসে।

অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সহ-সর্বাধীশ কিঙ্কর সামানন্দজী উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। কিছু দীক্ষার্থী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আশ্রয় পান। কিঙ্করী যোগমায়াদেবী সুদীর্ঘ ভাষণ দানে উপস্থিত শ্রোতাদের আপ্লুত করেন। চিন্ময়দা চন্দননগর আশ্রম পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে প্রসাদ নিতে আহ্বান জানান। কিঙ্কর শরণানন্দ সংক্ষিপ্তভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন ওঙ্কারনাথ মিশনের পক্ষ থেকে কিঙ্কর দীপক দেবনাথ, কিঙ্কর সমীরণ, কিঙ্কর নয়ন সাধুর উদ্যোগে শ্রীনামের বাহিনী উত্তাল নাম করেন। ফলে ত্রি-প্রাপ্তি ঘটে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে। শ্রীনামে অবগাহন, যোগমায়া পিসিমার ঠাকুরকথা আর আশ্রমের অপূর্ব প্রসাদ। আমরা তো একটা কাজ করতে পারি—প্রতিবছর দশহরার দিন গঙ্গাশ্রমে মা গঙ্গার পুজোটা তো করতে যেতে পারি।

চৈতন্যধাম ওঙ্কারনাথ মঠ নবদ্বীপে নূতন মন্দির নির্মাণকল্পে ভূমিপূজন মহোৎসব

ভগবান ওঙ্কারনাথদেবের অপার করুণায় অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত ১৩ই জুন ২০১৪, নবদ্বীপের ঐতিহাসিক শ্রীবাস অঙ্গন ঘাটের পরে নয়নতারা ঘাট সংলগ্ন পুণ্যসলিলা গঙ্গাতীরে পুরনো আশ্রমবাটী সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় সম্প্রদায়ের অন্যতম অছি পরিষদ সদস্য, সুদক্ষ পরিচালক, কর্মদ্যোগী ও একনিষ্ঠ নিরলস সেবক শ্রীযুক্ত করুণাময় সেনশর্মা দাদার সুযোগ্য নেতৃত্বে খুব ধুমধামের সাথে আশ্রমে নতুন মন্দির নির্মাণকল্পে ভূমিপূজন ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে ৩-৪টি গাড়ীযোগে বিশিষ্ট ভক্ত সেবক ও সংগঠক সদস্যরা আগেরদিন বিকেলে পৌঁছে যান আশ্রমে। এছাড়াও পৌঁছে যান কালনা থেকে ঘোষালদার নেতৃত্বে প্রায় ৬০জন নামকারীসহ ভক্তবৃন্দ। সারারাত ধরে চলে মহোৎসবের আনন্দ। ভোর ৫টা থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা শ্রীনাম সংকীর্তনসহ নগর পরিক্রমা করা হয়। পরে নামমঞ্চে চলতে থাকে উদয়াস্ত নাম। কলকাতার মহামিলন মঠ সতীসংঘের মায়েরাও কিছুক্ষণ নামকীর্তন করেন। ওদিকে চলতে থাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত বিগ্রহের সামনে পূজা-হোম-যজ্ঞ। সেনশর্মাদার সুনির্বাচিত পুরোহিতদ্বয় মহামিলন মঠের শ্রীবকুল ও শ্রীহরি সুচারুভাবে পূজাপাঠ সমাধা করেন। বিকেল ৩টের সময় ট্রাস্টির মহাসচিব শ্রদ্ধেয় শ্রী গোপাল মিত্রদা উপস্থিত হয়ে সকলকে উৎসাহ প্রদান করেন এবং কিছুক্ষণ শ্রীনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করে আনন্দ পান ও সবাইকে আনন্দ প্রদান করেন। পূজা চলাকালীন বৈদিক বিদ্যালয়ের ৫জন বেদ পাঠকের সুমধুর ছন্দে সমবেত বেদ পাঠে উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। গঙ্গার ওপার থেকে কৃষ্ণনগরবাসী বিশিষ্ট কিছু গুরুভাইবোন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ৫০০জন ভক্ত প্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত হন। সবার প্রসাদান্তে বিকেল ৪টার সময় গোপালদা ও করুণাময়দা প্রসাদ গ্রহণ করেন। সূর্যাস্তের পর শ্রীনামের জয় দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এই কর্মকাণ্ডে যাদের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল সর্বশ্রী বিজয় শীল, রতন পাল, মৃণাল সাহা, কিঙ্কর জনার্দন, পাণ্ডা দা, দত্ত দা (মাষ্টারমশাই) ও অন্যান্য গুরুভাইবোন।

—দীপক দেবনাথ

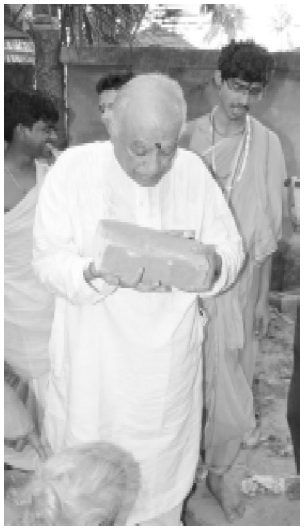

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনরত শ্রদ্ধেয় গোপাল মিত্রদা, পাশে পুরোহিত বকুল।

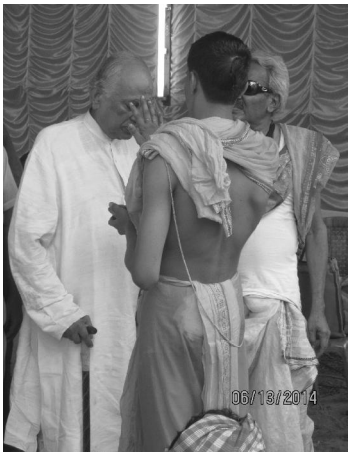

যজ্ঞের টিকা গ্রহণরত গোপাল মিত্রদা এবং সেনশর্মাদা

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রাক্কালে নিরীক্ষণরত ডানদিক থেকে সেনশর্মাদা, রতন পাল এবং ঘোষালদা।

নামমঞ্চে উপবিষ্ট ডানদিক থেকে সেনশর্মাদা, মাঝে সতীসংঘের মায়েরা এবং বামদিকে পাঁচজন বেদ পাঠকগণ।

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা মহোৎসব

শ্রীগুরুবিগ্রহেষু/শ্রীগুরুমূর্তিষু,

আগামী ২৭শে আষাঢ়, ১৪২১, শনিবার (ইং ১২ই জুলাই ২০১৪) সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয় মহামিলন মঠে, বিশেষ শ্রীশ্রীগুরুপূজা, পুষ্পাঞ্জলি, হোম, প্রার্থনা, ধর্মসভা ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পত্রে উল্লিখিত সূচী অনুসরণ ক'রে শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা মহোৎসব পালিত হবে।

আপনাদের উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে প্রার্থনীয়।

২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০

নিবেদক

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস

শ্রীপল্লব গুপ্ত	**শ্রীগোপাল মিত্র**	**কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ**
কোষাধীশ	*মহাসচিব*	*সর্বাধীশ*

অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়

ঃ যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ

আশ্রম সেবক, মহামিলন মঠ, কলকাতা - ১০৮ ফোন ঃ ২৫৭৭-৫১৭৯

ঃ অনুষ্ঠান সূচী ঃ

২৭শে আষাঢ়, ১৪২১, শনিবার (ইং ১২ই জুলাই, ২০১৪)

সকাল ৮-০০ ঃ **শ্রীগুরুপূজা, হোম, শ্রীগুরুগীতাপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি**
পৌরোহিত্যে ঃ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরামরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ।
প্রার্থনা সভা পরিচালনায় ঃ কিংকর প্রণবানন্দ বেদতীর্থ।

৮-৩০ ঃ **নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা**
পরিচালনায় ঃ মহামন্ত্র মহাপ্রচারক কিংকর বিরাগানন্দজী।
ব্যবস্থাপনায় ঃ যুবক সংঘ, ওঙ্কারনাথ মিশন।

৯-০০ ঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি স্বরূপ সর্বাধীশজী কর্তৃক দীক্ষাদান।
শ্রীগুরুবন্দনায় ঃ সুরসাধক কিঙ্কর বিপুলানন্দজী।

১০-৩০ ঃ **শ্রীগুরুলীলা ও তত্ত্ব অনুধ্যান**
অংশগ্রহণে ঃ কিংকর সহজানন্দজী, কিংকর বিরাগানন্দজী, কিংকর শরণানন্দজী, কিংকর সেবারাম দুর্গানন্দ, কিঙ্কর সমীরণ, শ্রী কমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

দুপুর ১২-০০ ঃ **শ্রীগুরুস্মরণে ঃ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজজী মহারাজ।**

১-০০ ঃ **পালাকীর্তন ঃ** শ্রীমতী মিঠু চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়।

১-৩০ ঃ **মধ্যাহ্ন প্রসাদ বিতরণ।**

বিকাল ৪-০০ ঃ মহামিলন মঠ সতীসংঘ কর্তৃক শ্রীনাম সংকীর্তন ও শ্রীগুরুমহিমাগীতি।

সন্ধ্যা ৭-০০ ঃ **পালাকীর্তন-** শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য ও সম্প্রদায়।
সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় ঃ শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী ও শ্রী অনুপ দাস।

তপন সিকদারের পরলোক গমন

পুরোপুরি এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। অদ্ভুত ব্যাপার হল একজন আধ্যাত্মিক চৈতন্য সম্পন্ন মানুষও বটে। এরকম বিরল গুণের সমাবেশ ঘটেছিল দু-দুবারের ভারতীয় সাংসদ তপন সিকদারের মধ্যে। গত ২রা জুন ২০১৪ সোমবার দিল্লীর এইম্‌সে তপন সিকদার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

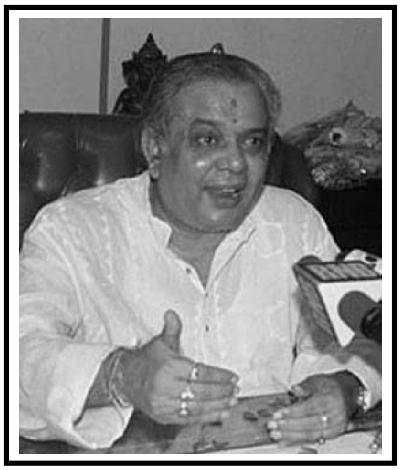

পিতা ডি. এন. সিকদার, মা বেলারাণীদেবী প্রথমদিকে অবিভক্ত বাংলার যশোরে থাকতেন। ১৯৪৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তপন সিকদারের জন্ম হয় ঐ যশোরেই। দুর্দান্ত বাম জমানায় তিনিই ছিলেন বিজেপি-র একমাত্র মুখ। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ লোকসভার সদস্য ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় পশ্চিমবাংলা থেকে তিনিই একমাত্র নির্বাচিত বি.জে.পি. সাংসদ ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল আধুনিকি করণে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সার এবং রসায়ন বিভাগেরও রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন।

একজন দক্ষ সংগঠক। বহু জায়গায় উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে তিনি সংগঠন গড়ে তুলে তাঁদের মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা দিয়েছিলেন। বহু জনহিতকর সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাটক দেখতে ভালবাসতেন, নাটক করতেও ভালবাসতেন। ব্যক্তি জীবনে অকৃতদার ছিলেন। নম্রতা ওর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ছিল। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ধর্মপ্রাণ মানুষ। সকাল থেকে উঠেই শাস্ত্রসম্মত আচার পালন করে তবে বহির্জগতের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

মহামিলন মঠে আসেন শ্রীস্বপন ভৌমিকের প্রেরণায়। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সর্বাধীশজী কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজের অত্যন্ত স্নেহের এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। প্রায়ই আসতেন সাক্ষাৎ করতে। আশীর্বাদ নিতে। শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবকেও নিজের গুরুর মত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। সীতারাম ভবনের দ্বিতল ভবন নির্মাণের সময় প্রচুর সহযোগিতা এবং সেবা করেন যা ভোলা যায় না। মহারাজজীর সঙ্গে তাঁর একটা ব্যক্তিগত সখ্যতা ছিল। মহারাজজী তাঁর সুখদুঃখে সর্বদা সমব্যাথী ছিলেন। ওঁর আহ্বান যেমন মহারাজজী ফেরাতে পারতেন না তেমনি মহারাজের কোনো আহ্বান উনি ফেরাতেন না। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সমস্ত আশ্রম ছিল তপনদা'র কাছে অবারিত দ্বার। সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে মহারাজ থেকে শুরু করে একজন সাধারণ সেবক পর্যন্ত সকলেই শোকাহত।

আমরা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

তপনদা'র অন্তেষ্টিক্রিয়াতে মহারাজের ঐকান্তিক ইচ্ছায় অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কিঙ্কর প্রণবানন্দ (মঠাধ্যক্ষ, মহামিলন মঠ), শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ-মঠাধ্যক্ষ, মহামিলন মঠ) কিঙ্কর শ্রীবৎস, শ্রী ধ্রুবব্রত চক্রবর্তী (সম্পাদক, যুবক সংঘ), শ্রী অনুপ দাস (সভাপতি যুবক সংঘ) এবং শ্রী সুবীর শেঠ (সহ-কোষাধীশ, ওঙ্কারনাথ মিশন) শ্মশানঘাটে উপস্থিত থাকেন।

প্রণাম

রা ম হ রি মু খো পা ধ্যা য়

সেই তো প্রথম, সেই তো শেষ—
আপন গাঁয়েই পেয়েছিলাম তোমার দরশ
আপন দোষেই পাইনি তোমার চরণ পরশ
তবু সে দরশই প্রাপ্তি আমার অশেষ।
স্মৃতিটুকু তার হৃদয়ে আমার অটুট রাখো নাথ,
দাও বরাভয়, ঠাকুর ওঙ্কারনাথ।
ঘোর সংসারী মানুষ আমরা, বস্তুবাদের স্তাবক
ভোগের বাহার আর জমার পাহাড় বানাতে
যত শ্রম আর কারিগরি ঢালি দিনে রাতে
এই ডামাডোলে তত্ত্বচিন্তা নেহাৎ নিরর্থক।
তাই আমাদের চিতে স্থির মতি দিতে, হে কৃপানাথ,
কৃপা হোক, ঠাকুর ওঙ্কারনাথ।
ধরাতলে পা রাখে, কোটিতে গুটিক, যে ক'জন
যারা মূঢ় মনে জ্ঞানের শলাকা দেয় জ্বেলে,
বুদ্ধির শুদ্ধিতে করুণার ধারা দেয় ঢেলে,
তুমি আছো সেই দলে, মৃত্যুঞ্জয়ী মহাজন,
রহ তুমি স্মরণে-মননে আমাদের সাথ।
লহ প্রণাম, ঠাকুর ওঙ্কারনাথ।।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল ভক্তশিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ, অযোধ্যার রাম-জানকী মন্দিরের উন্নয়নকল্পে এবং সম্প্রদায় আচার্য্য বিদ্যানন্দজীর ওঙ্কারলোকপ্রাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত সাধু ভাণ্ডারার জন্য সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টের মাধ্যমে অর্থ সেবা করে কৃতার্থ হউন।

Bank Name : Allahabad Bank
Branch : Ramjanaki Mahal Trust Parikrama Road
A/c. Name : Sri Ramjanaki Mandir Sri Sitaramdas Onkarnath Ashram
A/c. No. : 50207007250
IFS Code : 224010009

জয়গুরু

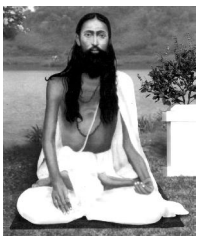

পরমগুরুদেব দাঁশরথিদেব যোগেশ্বরের আশীর্বাণী

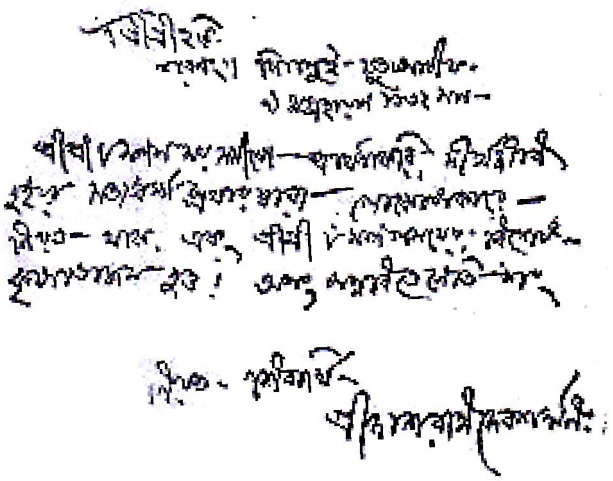

জয়গুরু

মাসিক মিলন পত্র

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

বৈশাখ, ১৪২১ দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচী ঃ

● মেদিনীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষণ □ রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬ ● তুই গাওনা গা □ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৮
● শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার পরিক্রমা □ হরিসাধন ভট্টাচার্য্য ৪১

মেদিনীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষণ

রা ম লা ল ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

২০শে মাঘ বুধবার রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় কাঁথি হইতে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ মেদিনীপুর শহরে পাহাড়পুরস্থ শ্রীরামরঞ্জন সিংহ মহাশয়ের বাটিতে শুভাগমন করেন। পরদিন ২১শে মাঘ বৃহস্পতিবার প্রভাত হইতেই শুরু হইল আনন্দের প্রবাহ, মঞ্চে চলিল নাম, কর্মকুঞ্জে দীক্ষার্থীদের আবেদন এবং দর্শন ও প্রণামের জন্য লোক সমাগম হইল প্রচুর। বাবা যথারীতি পূজা ও প্রণামাদি নিত্যকর্ম সারিয়া সকলের প্রণাম গ্রহণ করলেন এবং দীক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রায় দেড়শো জনকে দীক্ষাদান ও আশীর্বাদ করিয়া তিনি ভোগনিবেদনান্তে কিঞ্চিৎ গ্রহণপূর্বক একটু বিশ্রাম লইলেন। বিশ্রামের পর ছিল নাম সংকীর্তন সহ শোভাযাত্রার আয়োজন। তিনি আবাসের কালীমাতা মন্দিরে গমন করেন। সন্ধ্যায় বল্লভপুরস্থ শ্রীগুরুমন্দিরে দিলেন তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত সুমধুর অমৃতময় ভাষণ। তিনি বলিলেন যে--- শ্রীভগবানের নাম করিলে মানুষ সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। 'রাম' নাম লইলে রোগীর রোগ, শোকীর শোক এবং দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর হয়। নামের নিকট যে যাহা চায়, সে তাহাই পাইয়া থাকে। কলিকালে নামই সুগম সাধন পথ। একালে মানুষ ধ্যান, যাগযজ্ঞ, তপস্যা, পূজা ও ব্রতাদি যথাবিধি সম্পাদন করিতে পারে না। কিন্তু হেলায় শ্রদ্ধায় যে কোন অবস্থাতে নাম করিতে পারা যায়। এইরূপ করিতে করিতে নামকারীর বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা শুদ্ধ হইয়া যায়। নাম হইল শব্দ এবং তাহাই ব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি। সর্বদা সর্বাবস্থায় নাম করিলে বহির্মুখী চিত্ত অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ বিষয়ের পঙ্কিলতা হইতে শুদ্ধ হইয়া নির্মলতা প্রাপ্ত হয়। নির্মল অন্তঃকরণে তখন নাদের আবির্ভাব হয়। নাদ জ্যোতিতে এবং জ্যোতি ওঙ্কারে লয় হয়। মানুষ বাহিরের সুখের জন্য লালায়িত। কিন্তু তাহার নিজের অন্তরেই প্রকৃত সুখ নিহিত রহিয়াছে। জ্ঞানিগণ বিচার বৈরাগ্যের দ্বারা, যোগীগণ অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা এবং কর্মীগণ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা যাহা লাভ করিয়া থাকেন, নামকারী ভক্তগণও নামকীর্তনের দ্বারা তাহাই পাইয়া থাকেন। নাম কানের ভিতর দিয়া মর্মে প্রবেশ করে এবং প্রাণকে আকুলিত করে। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বিরহিনী শ্রীরাধা একবার 'শ্যাম' নাম শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

''সখি! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥''

শ্যাম দর্শনের জন্য ব্যাকুলা শ্রীরাধা 'শ্যাম' নাম করিতে করিতে তন্ময় হইয়া তৎসারূপ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তখন শ্যামের ন্যায় শ্রীরাধার বিরহে কাতরা হইয়া 'রাধা রাধা' জপ করিতেন। তিনি আরও বলেন যে মনকে শীঘ্র অন্তর্মুখী করিবার জন্য নামের সহিত আহারের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা প্রয়োজন। যেখানে সেখানে যা তা আহার করিলে মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়। তাই তিনি সকলকে দেহের উত্তেজনাবর্দ্ধক ডিম, মুরগী, হাঁস, গুগ্‌লি, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন, মদ, চা, বিড়ি ও সিগারেট প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। নাম মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি একটি সুন্দর গল্প বলেন।

এক পরিবারে দুটি ভাই ছিল। ছোট ভাই নামের ভক্ত ছিল। বড় ভাইয়ের নামে রুচি ছিল না। একদিন বাড়ীতে এক সাধুবাবা আসেন। তিনি আসিলে নাম সংকীর্তন আরম্ভ হইল। বড় ভাই বিরক্ত হইয়া ঘরের ভিতর কপাটে খিল দিল এবং কর্ণে আঙ্গুল দিয়া বসিয়া

রহিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল কখন উহারা বিদায় হয়। ভাই ক্ষুণ্ণ মনে এই কথা সাধুবাবাকে বলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাধুবাবা সংকীর্তন দলকে বিদায় দিলেন এবং নিজে সেই বাটীর এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। বড় ভাই অনেকক্ষণ নামের শব্দ না শুনিয়া যখন ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল, তখন সাধুবাবা গৃহকোণ হইতে বাহির হইয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিলেন এবং জোরপূর্বক তাহার কর্ণে 'রাম' নাম দিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে বড় ভাইয়ের মৃত্যু হইল। যমরাজের চরগণ তাহাকে যমপুরীতে লইয়া গেল। যমরাজ চিত্রগুপ্ত দেখিলেন যে তাহার মাত্র একবার 'রাম' নাম শুনা হইয়াছে। এই পুণ্যকর্মের ফল কি তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া যমরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। ইন্দ্র তাহা বলিতে না পারায় তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট যাইলেন। ব্রহ্মাও তাহা বলিতে পারিলেন না। তখন সকলে মিলিয়া মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। পঞ্চানন অহর্নিশ পঞ্চমুখে 'রাম' নাম করিলেও একবার মাত্র 'রাম' নাম শ্রবণের ফল বলিতে অকৃতকার্য্য হইলেন। তখন সকল দেবতা সেই বড় ভাইয়ের অশরীরী আত্মাকে লইয়া বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য নিবেদন করিলেন। শ্রীবিষ্ণু তখন সহাস্যে বলিলেন যে একবার মাত্র 'রাম' নাম শ্রবণের ফল তো দেখাই যাইতেছে। ওই লোকটির একবার নাম শ্রবণের জন্য আজ সমস্ত দেবগণ সহ তাহার বৈকুণ্ঠে আগমন সম্ভব হইয়াছে। অতএব ফল বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি। তখন সকল দেবগণ ও যমরাজ বড় ভাইকে তথায় রাখিয়া বৈকুণ্ঠনাথকে প্রণাম করতঃ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর নারীগণকে কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করিতে বলেন, নারীগণের পতিই পরম গুরু। একমাত্র পতিসেবার দ্বারা তাহারা অনায়াসে ভবসাগর পার হইতে পারে। তিনি সকলকে পিতামাতার সেবা করিতে বলেন। পিতামাতার সেবাদ্বারাও ভগবল্লাভ করা যায়। তারপর তিনি পুত্রের পিতাগণকে বিবাহে পণ লইয়া পুত্রকে বিক্রয় করিতে নিষেধ করেন। তিনি যুবকগণকে বলেন যে তাহারা যেন তাহাদের পিতামাতার পায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে নিষেধ করে। তিনি বলেন যে যেরূপ ব্যবহার করিবে, সে তদ্রূপই পাইবে। যে পিতামাতার সেবা না করিবে, ভবিষ্যতে সেও তাহার পুত্র কর্তৃক অনাদৃত হইবে। এবং এ বিষয়েও তিনি একটি গল্প বলেন। একটি ছেলে প্রত্যহই দেখে যে তাহার ঠাকুরদাদা একটি ভাঙ্গা পাথরে ভাত খায় ও প্রতিদিন অতিকষ্টে তাহা ধুইয়া রাখে। তাহার বাবা মা ও সে কিন্তু ভাল থালায় খায় এবং তাহা পরিষ্কার করিবার লোকও আছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদার প্রতি তাহার পিতামাতার এইরূপ আচরণ দেখিয়া সে প্রাণে আঘাত পাইল। একদিন বৃদ্ধ পাথরটি মাজিতে যাইয়া পড়িয়া গেল ও তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এই সুযোগে ছেলেটি একটি লাঠি লইয়া বৃদ্ধকে শাসাইতে ও মারিতে উদ্যত হইল। তাহাতে তাহার পিতামাতা বিরক্ত হইয়া পুত্রকে এইরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে বৃদ্ধ তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে। কেন না তাহার পিতামাতা বৃদ্ধ হইলে যাহাতে সে তাহাদিগকে খাইতে দিবে, সে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ইহাতে পিতামাতার জ্ঞানোদয় হইয়াছিল।

এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে অশেষ আনন্দ দান করিয়া সেই রাত্রেই মোটরগাড়ী যোগে কোতলপুর রওনা হইলেন।

তুই গাওনা গা

শ চী ন্দ্র না থ মু খো পা ধ্যা য়

ভৈরবী মা বাগানে কর্মরতা, তাঁকে দেখেই হঠাৎ ঠাকুর ব'লে উঠ্লেন—'ওগো দেখ তুমি কাদা চটকাও আর আমি জল ঢালি, প্রায় ৮০ বছর আগে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর পরিবেশ সুস্নাত ক'রে তুলেছিল যে বাণী আর উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় যে কাদা তৈরী হলো তাতেই গড়ে উঠলো দ্বাদশটি মানসপুত্র। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তটপ্রান্তে আম্রকানন পরিবেষ্টিত এক সান্ধ্যবাসর মুখরিত ক'রে তুললো তেমনি এক মহাপুরুষের বাণী—'আমি আসর পেতেছি, তুই গাওনা গা'।

প্রয়াগে মাঘীপূর্ণিমা স্নানের সৌভাগ্য লাভ করলাম কিন্তু অর্দ্ধকুম্ভের সমাবেশে সাধুদর্শন তা আর হোলো না। কিন্তু এই তীর্থপথের যোগসূত্র টেনে এক পরমসৌভাগ্য লাভের সন্ধান পেলাম। এলাহাবাদ থেকে ফেরার পথে নেমে পড়লাম দিলদারনগর স্টেশনে। সেখান থেকে এক শাখা লাইন গেছে গঙ্গা তীরবর্তী স্টেশন তাড়িঘাট, মাত্র ১ মাইল দূর, ওপারে গাজিপুর শহর—উত্তরপ্রদেশের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী জেলা। মা গঙ্গা গাজিপুর শহর ও তাড়িঘাটকে দক্ষিণ ও বামহস্তের স্নেহস্পর্শ দিয়ে শস্যশ্যামল ক'রে প্রবাহিতা। তাড়িঘাট পূর্ব রেলপথের এক প্রান্তরেখা আর অপর পারে উত্তর-পূর্ব রেলপথের হয়েছে একদিকের সূচনা। 'সুরধুনীর তীরে ও কে হরি ব'লে গেয়ে যায়...অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' এই ক্ষুদ্র জনপদ আজ মুখরিত হ'য়ে উঠলো কার আগমনে, কেন আজ রেলপথেও নিত্যনূতন যাত্রী সমাগম। স্টেশনের অনতিদূরে মাঘের সংক্রান্তিতে আজ বিশেষ মেলা। আম্রকাননতলায় এক ক্ষীণকায় বিশেষ পুরুষকে বেষ্টন ক'রে আছেন কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ। এই যে সেই আমাদের ভবরোগের কাণ্ডারী নাম বিলাতে বিলাতে আজ নব আবেশে আবিষ্ট—কাল থেকে তিনি তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেবের প্রয়াণক্ষেত্রে মৌন নেবেন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। আমাদের এই ঠাকুরটি কালকেই কাশীধাম থেকে এসেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে মহাপ্রয়াণ মঠটির উদ্বোধন। মহাপ্রয়াণ মঠ নামটি বেশ প্রাণস্পর্শী, গৃহীত হইবে কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ—ভবরোগের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই মনে ভেসে ওঠে মহাপ্রয়াণের ওতপ্রোত সম্বন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তাল রেখে দিন রাতে কতবার প্রয়াণ আসে কিন্তু এই মহাপ্রয়াণের কথা ভেবেছ কি মন! যাত্রীরা হুঁশিয়ার। আমাদের 'প্রপন্নো♦সি' বলার শক্তি দাও ঠাকুর, ফের দিয়ে বাঁধতে দু আঙ্গুল ছোটই থেকে যাচ্ছে।

আমাদের কেন্দ্রমণির ঠাকুর (দাশরথি স্মৃতিভূষণ) এই স্থানটিতে নশ্বর দেহত্যাগ করেন আর তারই স্মৃতিতে গড়ে উঠেছে এই মঠ এবং স্থানটিকে শুধু প্রাণবন্ত ক'রে তোলা নয় নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলার জন্যে আজ মধ্যরাত্রি থেকে শ্রীশ্রীগুরুদেবের মৌনাবলম্বন। আমাদের এই দাদু পরম গুরুদেবটি ২৭ বছর আগে কর্মব্যপদেশে তাঁর শিষ্য তাড়িঘাটের তদানীন্তন স্টেশন মাষ্টার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই কর্মস্থানে এসে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন।

স্টেশনের অতি সন্নিকটে এই মঠে এখনও প্রস্তুতির কাজ চলছে। হয়তো দীর্ঘদিন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবে না তাই ঠাকুরকে ঘিরে তাঁর বিরক্ত ও গৃহী শিষ্যশিষ্যারা বসে রয়েছেন, কর্মপন্থা, লেখাপড়া কত আলোচনা ও উপদেশ চলছে। শ্যামল ক্ষেত্রগুলির পাশে মুক্ত প্রাঙ্গণে বসেছে এই ভক্ত সম্মেলন, দূরে কুলুকুলুনাদিনী দিক্‌চক্রবালে রেখা টেনে চলে গেছেন। সমাবেশে স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষও অনেকে এসেছেন, গ্রাম

দূরে কিন্তু দূরাগতের এক আকর্ষণ তাদের টেনে এনেছে। সতীত্বের মাহাত্ম্য, নারীর কর্তব্য সম্বন্ধীয় কয়েকখণ্ড অভিনব পাণ্ডুলিপি ঠাকুরকে উপহার দিয়েছেন সীমলাগড়ের শ্রীমত্যা রাধারাণী। প্রথম খণ্ডটি ঠাকুর একান্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়ে সবাইকে শোনাচ্ছেন। বৃদ্ধাকে দেখে মনেই হয় না এই অমূল্য উপদেশাবলী কি ক'রে তাঁর লেখনীর মুখে ফুটে উঠ্‌লো, প্রগাঢ় শিক্ষারও দাবী করেন না তিনি। দীর্ঘ ২৮ বছরের সংগৃহীত এই সম্পদ, আবেশের মুখে এর প্রকাশ। আবেশিত চিত্তে সবই সম্ভব তাই পুরাণ-উপনিষদাদির নির্য্যাস সাগ্রহে শুনছেন সবাই, আর শুনছেন ঠাকুরের সরল ব্যাখ্যা। ঠাকুর ব'লে উঠলেন, ওরে আমার লেখার কথাগুলোর সঙ্গে সব ঠিক ঠিক মিল হচ্ছে, আমি বক্তৃতাতেও এসব কথাই বারবার জোর দিয়ে ব'লে আস্‌ছি। বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন—'সীতারাম তোর এসব গ্রহণ কর্‌লো, আমি আসর পেতেছি, তুই গাওনা গা, আয় তোকে আশীর্বাদ করি।' 'ওরে মায়েদের কথা মায়েদেরই বল্‌তে হবে, তোকে দিয়ে সে কাজ চল্‌ছে।'

ঠাকুর তুমি তো আশীর্বাদ কর্‌লে কিন্তু আমরা আজ প্রগতিকে ছাড়িয়ে উগ্র প্রগতির পথে, সেখানে সতীত্ব, পাতিব্রত্য ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী কুসংস্কার ব'লে বিবেচিত হ'তে চলেছে। স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের চুলচেরা বিচার করছেন রাষ্ট্রনায়ক আর সমাজপতিরা। ঠাকুমা, দিদিমা, পিসীমা, জেঠিমা অপেক্ষা সিনেমাই আজ প্রিয়তর আর তাদের নাম গান হাবভাব সমাজকে পেয়ে বস্‌ছে তাই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কীর্তনাদির পরিবর্তে চল্‌ছে মাইকে সিনেমা সঙ্গীত। পরিবার-পরিকল্পনার নামে চলেছে ব্যভিচারের পথ প্রস্তুতিকরণ। উন্নত, কর্মজীবনের সহধর্মিণীর ধর্ম হ'য়ে যায় সংসারের কর্তব্য ছেড়ে বান্ধবীরূপে মেশামেশি করা। এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে? ঠাকুরের ভাষণ, মাতৃপূজা, আয় ফিরে আয় প্রভৃতি ঘোষণা করছে 'পথিক তুমি পথ হারাইতেছ।' 'কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়া ভূ যত্নতঃ' কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে কই? তাইতো দিকে দিকে সংসারে সংসারে দাবানল উঠছে, শালীনতা, শৃঙ্খলার বোধ ভেঙ্গে পড়ছে।

পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে কত হাসি-খুশীর কথা হচ্ছে, মাঝে মাঝে ইংরাজী, হিন্দীর মাধ্যমে আনন্দ দান করছেন। মৌনাবলম্বনের বিচ্ছেদ যত এগিয়ে আস্‌ছে ততই যেন বালকসুলভ পরিবেশে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। পাণ্ডুলিপি পড়া ও আলোচনা, তারপর সম্প্রদায়ের মঠমন্দিরের সুব্যবস্থা, নামযজ্ঞ ইত্যাদি নির্দেশ দিলেন প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। চন্দ্রালোকিত আকাশে কিন্তু যেন একটা আবছা অন্ধকারের আবরণ নেমে আসছে তাই সকলের প্রাণ ও মনের চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছে। সকলেরই ইচ্ছা—ঠাকুরের শ্রীমুখের শেষ কথাটি শুনে নি, হয়তো কতদিন শুনতে পাবো না। মুক্ত প্রাঙ্গণে এই সমাবেশ, শীত থাকলেও শৈত্যবোধ যেন চলে গেছে। হঠাৎ ঠাকুর পঞ্জিকার খোঁজ করতে লাগলেন, পঞ্জিকার পাতা উল্টে এক হৃদয়বিদারক কথা ব'লে সকলকে আরও চঞ্চল ক'রে তুললেন—অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যৎবাণী যদি সত্যি হয় তবে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ আমার পরমার্থ প্রাপ্তির দিন। সবার মনে তীব্র আলোড়ন—সজল নয়নে মন ব'লে উঠলো 'যেতে নাহি দিব'। সবার অন্তরের ভাষা, প্রতিক্রিয়া ঠাকুরের অবোধ্য নয় কিন্তু তিনি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' যিনি কিছুদিন আগে ছিলেন 'মৃদূনি কুসুমাদপি'। ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন—'কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, নাম পরতাপে যার ঐছন করলো গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়'—শ্যাম নামে বিভোর শ্রীরাধারাণী কি শ্যামসায়রে মিশে যাবার জন্যে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু এ কলির কৌশলের ফাঁদ যে বেড়েই চলেছে, কে 'আঘাতে আঘাত কর' ব'লে ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরীকে জাগাবে!

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করতে গেলেন সেই অবসরে আমাদের সামান্য জলযোগ ইত্যাদি সুযোগ দেবার জন্যে। কিন্তু আশু বিচ্ছেদানলের গোলযোগের কথায় সবার মন এতই ভারাক্রান্ত যে জলযোগে তেমন ইচ্ছা নেই।

অর্দ্ধরাত্রি, বিদায়ের ক্ষণ ঘনিয়ে এল। ঠাকুর বাইরে এলেন—এবার সকলের কাছে বিদায় নেবার

পালা। এবার ঠাকুরের হাবভাব, দৃষ্টিভঙ্গি যেন এক আবেশে আচ্ছন্ন—উদাস দৃষ্টি, যেন মনটা কোথায় রেখে এসেছেন—কিছুক্ষণ আগের ভাব আর নেই, 'আবেশে অবশ তনু।' বললেন—'তোরা নাম ধর।' নাম ক্ষীণ কণ্ঠে আরম্ভ হলো—কণ্ঠ আজ সবার রুদ্ধ নয়নদ্বয় বাষ্পাকুল। আবেগের বেগ ঠেলে নামও কণ্ঠনালীর ভেতর গুম্‌রে উঠছে। ছেলেদের ও মেয়েদের স্পর্শ, প্রণাম ও আলিঙ্গন চল্‌লো আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের রোল—কত সুরধনী বহে সবার নয়নে। সবাকার মন যেন বলছে—'বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও।' স্পর্শ, প্রণাম, আলিঙ্গন ও কয়েকটি আশ্বাসবাণীর সঙ্গে ঠাকুর নিজেও হাত জোড় ক'রে নিজের মৌনকুটীরের দিকে পিছু হট্‌তে লাগলেন। এই বাস্তববাদী ছেলেমেয়েরাও আজ তাঁর কাছে ইষ্টমূর্তি—সর্বং খল্বিদং... তাই ব'লে উঠলেন 'বাবারা মায়েরো তোরা সীতারামের ইষ্টমূর্তি, তোদের প্রণাম...। মনে পড়ে গেল ৪৩ বছর আগে পরমগুরুদেব এই শিষ্য শিরোমণির উদ্দেশ্যে যে কাগজ দেন—'গুরুর্বা শিষ্যো বা ভবসি কতরো ন বিদিতম্‌। কিন্তু এসব ইষ্টমূর্তি কাঠমোল্লা জোর মক্কা পর্যন্ত দৌড়। ওগো দেবতা, গড়ে তোলো তোমার উত্তরসাধক।

বিদায়বেলার যে করুণ দৃশ্য লেখনীর মুখে প্রকাশ করা যায় না, আমাদের ঠাকুরটি কিন্তু এমন বজ্রাদপি কঠোর নয়ন শুষ্ক দৃষ্টি উদাস। সকলের পাশ কাটিয়ে বৃহত্তর প্রচেষ্টার পথে নিজ দেহযন্ত্রটিকে নিয়ে গেলেন কুটীরের দুয়ারে—মনে হচ্ছে মনটা আগেই চলে গেছে স্বকার্য সাধনে। করজোড়ে সকলের কাছ থেকে শেষ একবার মৌন বিদায় নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন, বাহিরের ভাঙ্গা হাটের সব হ'য়ে গেল 'ইহ বাহ্য'...'অন্য কহ কিছু আর...। আর এদিকে—

''গোকুলে উছলল
করুণার রোল
নয়নের জলে দেখ
বহয়ে হিল্লোল''

কম্বল নিয়ে নিদ্রার কোলে বিশ্রাম করার জন্যে যখন এক কোণে স্থান সংগ্রহ করলাম তখন দুটো বেজে গেছে। মনের চিত্রপটে যেন একদিনের ক'ঘণ্টার কত আলেখ্য পেয়ে বসেছে তাই নিদ্রাদেবী দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন পরে এ আলেখ্য আর কদিনই দেখলে, দেখে নে। কি করবো ঠাকুর, 'যন্ত্রারুঢ়ানি মায়য়া' যা দেখাচ্ছো তাইতো দেখবো। যত নিবারিতে চাই নিবার না যায়গো'...হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চলো সখা। চিন্তার স্রোতে ভাসতে ভাসতে পতিতপাবনীর অপর পাড়ে দিকচক্রবালে যেন উষাদেবীর মৃদু পরশ দেখা গেল তাই চলে এলাম শান্তিময়ীর কোলে। প্রাতঃকৃত্য সেরে তারিঘাটের মায়ার বন্ধন কাটিয়ে সংসারের মোহ বন্ধনের প্রস্তুতি চললো। অনেক ভাগ্যবান ভাগ্যবতী দাদা-দিদিরা ঠাকুরের জন্মতিথি ৪ঠা ফাল্গুন পর্যন্ত থেকে যাবেন ঠিক করেছেন কারণ সেদিন আবার তাঁদের ভাগ্যে স্পর্শ প্রণাম ঘটবে। আবার হবে মনে মনে জানান তবে যাবার আগে একবার শ্রীচরণ দর্শন ক'রে যাবার ইচ্ছা হোলো। বিশেষ প্রচেষ্টা না করেও শ্রীচরণদর্শন সফল হলো—শৌচ গৃহ থেকে মৌনগৃহে এগিয়ে যাচ্ছেন—বেড়ার ফাঁকে পা দুটি স্পষ্ট দেখা গেল। প্রণাম জানিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম স্টেশনে। গাড়ী ছেড়ে দিল, গাছের ফাঁকে ফাঁকে এখনও কুটিরটি দেখা যাচ্ছে, আর নেই। অড়হর ক্ষেতের শ্যামলিমা আড়াল ক'রে ছিল দৃষ্টিপথ থেকে সেই জ্যোতিষ্কটিকে। মন আবার তুলে নিয়ে এলাম—তাতল সৈকতে সুতমিত রমণী সমাজে...। মনের কোণে অনেকক্ষণ সেই সুরটি জেগে রইল—কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। বাষ্পীয় যানের চাকার ঘর্ষণেও যেন সেই সুর ভেসে আসছে। মনে মনেই জানাতে বলেছ তাই মানসপূজার শেষে বলি—দয়া জনু ছোড়বি মোয়' কিন্তু—

'গণইতে দোষ গুণলেশ না তাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার'

তবুও ঠাকুর মনে রেখ—''জগবাহির নহ মুঞি ছার।''

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার পরিক্রমা

হরিসাধন ভট্টাচার্য্য

৭ই মাঘ ১৩৬৬ বাবা ভোর ৪টায় উঠেছেন। শৌচান্তে ভস্ম তিলক ধারণ করত প্রাতঃকালীন পূজার পর দীক্ষার্থীদের কাছে এলেন। আজ বাবার কার্শিয়াং যাবার কথা তাই দীক্ষার্থীদের বলা ছিল ৬টার মধ্যে বসতে হবে। ৬০জন দীক্ষার্থীর প্রাথমিক কাজ দিয়ে দর্শনার্থীদের কৃপা করার পর দীক্ষা শেষ ক'রে ফলপ্রসাদ নিয়ে যখন গাড়ীতে উঠলেন তখন বেলা সওয়া এগারোটা। আশুদার বাড়ী থেকে বাবা তাঁর অপার কৃপাপ্রাপ্ত সেবক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। আগে থেকেই খুব নামকীর্তন চলছিল। বাবা গাড়ী থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে শত শত নরনারী এসে আক্রমণ করল। বাবা এসে ব'সে প্রথমে তাদের ক্ষুধা মিটাতে লাগলেন।

তারপর বাবা প্রসাদ করার জন্য বাড়ীর ভেতরে এলেন। বাড়ীর মায়েরা নিজহাতে বাবার খাবার জন্য বহুপ্রকার সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, রাজভোগ, ক্ষীর, ছানার পায়েস, মোয়া প্রভৃতি কমপক্ষে পঁচিশ রকম সমস্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বড় বড় গামলা গামলা, কোন কোনগুলি মণ মণ। বাবা হাসতে হাসতে বললেন এত অল্পে সীতারামের পেট ভরবে তো? সমস্তগুলিকে বাবার স্পর্শ করতেও অনেক সময় লাগবে। বাবা সামনের যতগুলি থেকে পারলেন বিন্দু বিন্দু খুব আনন্দের সহিত গ্রহণ করলেন।

আবার প্রণাম নিতে বসেন এই অবসরে সঙ্গী সেবকরা প্রসাদ নিতে বসেন। সকলের আকণ্ঠপ্রসাদ নিয়ে ফিরে আসার পর বাবাও গাড়ীতে এসে বসলেন। ১২-১৫ মিঃ-এ বাবার গাড়ী ছেড়ে তীর গতিতে ছুটল কার্শিয়াঙ অভিমুখে। সওয়া ১টার সময় গাড়ী হিমালয়ের পাদদেশে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে গাড়ী ক্রমশঃ হিমালয়ে উঠতে থাকে।

আমরা মহাকবি কালিদাসের 'কুমার সম্ভবে' এই হিমালয়ের অদ্ভুত বর্ণনা অধ্যয়ন করেছি। কালিদাস এই পর্বত শ্রেষ্ঠকে দেবতাদের আশ্রয় স্থান এবং পৃথিবীকে মাপিবার মানদণ্ড স্বরূপ বলেছেন। কবি আরও বলেছেন উজ্জ্বল ও মহৌষধী সকল পৃথিবী হ'তে দোহন করতে এই হিমালয় তার বৎস।

আরও বলেছেন—

অনন্ত রত্ন প্রভবস্য যস্য
হিমং ন সৌভাগ্য বিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
মিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥

অসংখ্য রত্নের আকর এই পর্বতরাজ; কিন্তু 'হিম' তাহার সৌন্দর্য্যনাশী হয় নি। যেমন চন্দ্রের 'কলঙ্ক' তার গুণনাশী হয় না, সেরূপ একটি মাত্র দোষ বহু বহুগুণের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে।

কপোল কণ্ডুঃ করিভির্বিনেতুং
বিঘট্টিতানাং সরল দ্রুমাণাম্।
যতশ্রুতক্ষীর তয়া প্রসূতঃ
সানুনি গন্ধঃ সুরভী করোতি॥

যেখানে হস্তিগণ গণ্ডঘর্ষণ দ্বারা সরল তরুরাজিগণকে কম্পিত করে ও সে তরুগুলির নির্য্যাস নির্গত হ'য়ে যে গন্ধ উৎপাদন করে সে গন্ধ সমস্ত সানুদেশ সৌরভময় করে।

এই অপরূপ দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে যাচ্ছি সেজন্য মধ্যে মধ্যে সেবাদা ও আমি নাম বন্ধ করছি, বাবা তাই দেখে বললেন—তোরা যদি নাম করিস্ সীতারাম আপত্তি করবে না। আমরা নাম করতে আরম্ভ করলাম। ভাবলাম বাবা পাঠে বলেন—

তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিক বান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্তুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ॥

সর্ব্বভূতের চির আকাঙ্ক্ষিত পরমবন্ধু গতি মুক্তি দাতা বাবা কি আর এই স্থাবর জঙ্গমকে ও নাম না শুনিয়ে থাকতে পারেন? এই কারণে বাবার কাছে অবিরত নাম চলতে থাকে। যে স্থানে নাম করা হয় না সে স্থান তো বাদ রয়ে গেল। তাদের প্রতি বন্ধুর ব্যবহার করা হল না। কাজেই সর্ব্বজীবের পরমাত্মীয় বাবার নিয়ম সর্ব্বত্র নাম করা।

বাবা মধ্যে মধ্যে মসলা খাচ্ছেন আমাদেরও দিচ্ছেন। কখন কখন এদিক ওদিক ক'রে মনোরম দৃশ্য পরিদর্শন করছেন। রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে রাস্তার এপাশ ওপাশ ঘুরে ঘুরে ছোট রেল লাইন দার্জিলিং গেছে। পশ্চিমবাংলার মধ্যে এই দার্জিলিং জেলা উল্লেখযোগ্য স্থান। কার্শিয়াঙ প্রভৃতি আবার স্বাস্থ্য-নিবাস। প্রায় পাঁচ হাজার ফিট উঁচুতে কার্শিয়াঙ একটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর শহর বলা যায়। বাবা যখন কার্শিয়াঙ 'গিরি নিবাসে' পৌঁছিলেন তখন বেলা দুটো। এখানে বাসকারীরা বললেন 'অন্য অন্য দিন মেঘলা বা কুয়াশাচ্ছন্নই থাকে আজ ঠাকুরের আগমনে সবিতৃদেব মেঘমুক্ত হ'য়ে প্রকাশ হয়েছেন। এখানে আজ অপেক্ষাকৃত শীতও কম।'

পূজনীয় শ্রীশ্যামাশঙ্কর দাদা, শ্রীরঘুনাথদা, মাধবানন্দদা, সুশীলদা এবং পদ্মলোচনদা পূর্বে এসে বাবার ভোগের ব্যবস্থা করছেন। সকলেরই মনে হচ্ছে আমরা যেন চড়ুইভাতি বা বন ভোজন করতে এসেছি। এক অদ্ভুত আনন্দে সব মাতোয়ারা। শ্রীশঙ্করদাদা ও শ্রীরঘুনাথদাদা তরকারি কুটছেন, কেউ আদা বাটছেন, কেউ গাছ থেকে কাঁচা তেজপাতা তুলে আনছেন। মাধবানন্দদা ভোগ রান্না করছেন যথাসাধ্য তাঁর সাহায্য করছি। পূজনীয়া লক্ষ্মীমা বাবার জন্য রস তৈরী ক'রে তাঁর প্রাণপ্রিয় আদরের গোপালকে খাইয়ে আমাদের প্রসাদ দিলেন। বাবা একবার ভোগ রান্নার কাছে এসে আগুন পোহাতে লাগলেন। বাবা তাঁর বাবার কোলে ব'সে কাকামণির কোলে শ্রীচরণ দুটি রাখলেন। আর একবার বোধহয় রঘুনাথ দাদার কোলেও রাখেন। বাবা মাঝে মাঝে কাঠগুলি সাজিয়ে উনুনের ভেতর দিচ্ছেন। আগে জ্বলছিল না ভাল, বাবা সাজিয়ে দিতে খুব জ্বলতে লাগলো।

পলোয়া করার জন্য সুশীলদা মাখন এনেছিলেন তাই দিয়ে ফুলকপি আলু মটরশুঁটি ও ট্যমাটো দিয়ে ভাল খিচুড়ী ও নানাবিধ ভাজা বাঁধাকপির ডাল্না পায়স প্রভৃতি রান্না করা হচ্ছে। বাবা ঘুরে ঘুরে দূরবীন দিয়ে মনোরম দৃশ্য সকল দেখতে লাগলেন। এ স্থানটি বাবার খুব পছন্দ হয়েছে। বাবা তাঁর মাকে বললেন এ মৌনের পর এখানে কিছুদিন থাকব কি বলিস্? মাও প্রার্থনা জানালেন থাকার জন্য। বাবা বললেন বৈশাখ থেকে এখানে থাকার ইচ্ছা রইল। এই দুরন্ত শীতের মধ্যেও বাবা ঘুরে বেড়াতে থাকেন। সেবাদা নীরজাকান্তদা বাবার বহু ছবি তুলে নিলেন। ''কাঞ্চনজঙ্ঘায়'' মনোমুগ্ধকর ও নয়ন সুখদায়ক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য এখান থেকে দেখা যায়। কার্শিয়াঙ এরও প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি মনোহারী।

রান্না শেষ হতেই রমানন্দদা বাবার ঠাকুরের ভোগ বাড়লেন, ধ্যানদা আরতি সাজিয়ে দিলেন আমি ভোগ নিবেদন ক'রে আরতি করতেই সচ্চিৎদা, সেবাদা, ধ্যানদা, রমানন্দদা নাম পাঠে যোগ দিলেন। প্রার্থনাদি সেরে বাবাকে নিয়ে এলাম ভোগের স্থানে। বাবা দুপুরের পূজাদির পর ভোগ নিতে বসেন। প্রসাদ নিয়ে এসে এঁটো হাতেই যারা খাচ্ছিলেন তাদের কাছে এসে বাবা তদ্বির করতে লাগলেন। বললেন—গরীবের বাড়ীতে এসেছ সব, খুদকুঁড়ো শাকাদি যা আছে সন্তুষ্ট চিত্তে খাও। আজ যেন সকলে অমৃত ভোজন করছেন। আজকের যে কি আনন্দ তা বর্ণনা করা যায় না।

৫টার মধ্যে এখানে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বাবা গাড়ীতে এসে বসলেন। ৬টায় গাড়ী ছাড়ল। খুব সাবধানে নামতে থাকে। বাবার পিছনে সেবকেরা আরও ৫টি মোটরকারে আছেন। যখন নীচে পাদদেশে শিলিগুড়িতে গাড়ী নামল তখন রাত্রি ৭-১৫ মিঃ।

ক্রমশঃ